চলো বেড়িয়ে আসি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মনোমোহন প্রকাশনী • কোলকাতা বারো

প্রকাশ করেছেন ঃ
প্রবীর ভট্টাচার্য
মনোমোহন প্রকাশনী
৫৪/৮, কলেজ ষ্ট্রীট, কোলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৫৯

প্রচ্ছদ ঃ বিপুল গুহ

ছেপেছেন :
গোপালচন্দ্র রায়
লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন, কোলকাতা-৬

বেঁধেছেন ঃ অনিল মল্লিক
৬০বি, বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কোলকাতা-৯

বরুণ বক্‌সী প্রিয়বরেষু—

সূচীপত্র

বাষট্টি/ছুছুমা
তেষট্টি থেকে চৌষট্টি/ধৌলি
পঁয়ষট্টি থেকে ছেষট্টি/চাকাপাদ
সাতষট্টি থেকে আটষট্টি/হীরাকুঁদ
উনসত্তর থেকে সত্তর/প্রধানপট/নৃসিংহনাথের মন্দির
একাত্তর থেকে বাহাত্তর/নন্দনকানন
তিয়াত্তর থেকে ছিয়াত্তর/কেওঞ্ঝর জশীপুরে
সাতাত্তর থেকে একাশী/ডায়মণ্ডহারবার থেকে কুঁকড়োহাটি
বিরাশী থেকে তিরাশী/রত্নগিরি ললিতগিরি উদয়গিরি
চুরাশী থেকে ছিয়াশী/রানীপুর ঝরিয়াল
সাতাশী থেকে নব্বই/চাঁদিপুর সৈকতাবাস
একানব্বই থেকে পঁচানব্বই/সপ্তমুখী সুন্দরবন
ছিয়ানব্বই থেকে আটানব্বই/গেঁওখালি বাংলো থেকে খৃস্টের সেবাসদনে
নিরানব্বই থেকে একশো দুই/সাগর মেলার অন্দরে
একশো তিন থেকে একশো পাঁচ/বনবাংলো রোগোদে
একশো ছয় থেকে একশো পনেরো/তরাইয়ের বনে পাহাড়ে

নির্দেশিকা

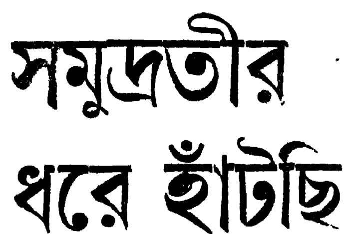
প্রকাশিত হচ্ছে—

চলো বেড়িয়ে আসি

(দ্বিতীয় পর্ব)

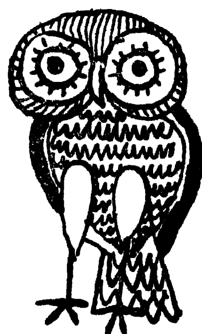
এতে থাকবে

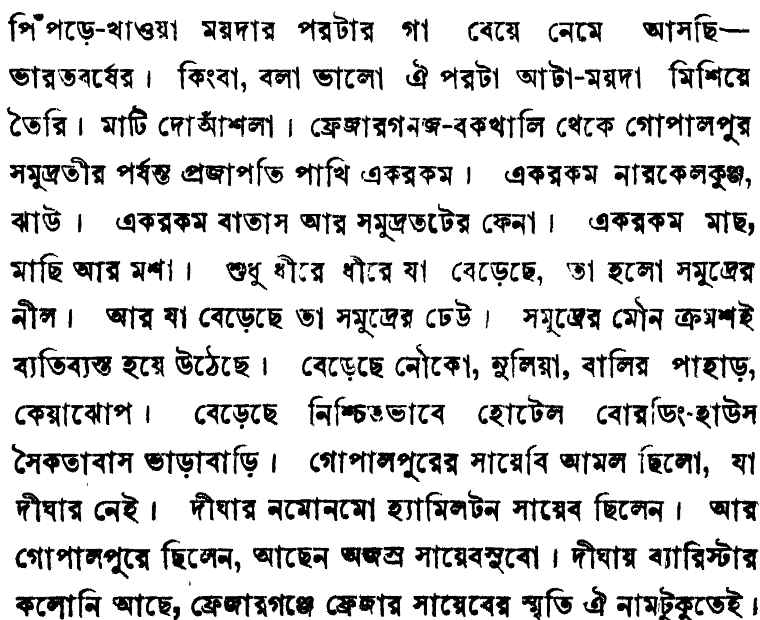
আসাম, সিকিম, ভুটান, দিল্লি, আগ্রা সহ উত্তর প্রদেশ, উত্তরবঙ্গ (বিশদভাবে) এবং পশ্চিমবাংলার আরো কয়েকটি অনিবার্য ট্যুরিষ্ট-স্পট ॥



সমুদ্রতীর ধরে হাঁটছি

ডায়মণ্ডহারবার
কাকদ্বীপ
নামখানা
ফ্রেজারগঞ্জ
গোপালপুর





পিঁপড়ে-খাওয়া ময়দার পরটার গা বেয়ে নেমে আসছি— ভারতবর্ষের। কিংবা, বলা ভালো ঐ পরটা আটা-ময়দা মিশিয়ে তৈরি। মাটি দোআঁশলা। ফ্রেজারগনজ-বকখালি থেকে গোপালপুর সমুদ্রতীর পর্যন্ত প্রজাপতি পাখি একরকম। একরকম নারকেলকুঞ্জ, ঝাউ। একরকম বাতাস আর সমুদ্রতটের ফেনা। একরকম মাছ, মাছি আর মশা। শুধু ধীরে ধীরে যা বেড়েছে, তা হলো সমুদ্রের নীল। আর যা বেড়েছে তা সমুদ্রের ঢেউ। সমুদ্রের মৌন ক্রমশই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে। বেড়েছে নৌকো, নুলিয়া, বালির পাহাড়, কেয়াঝোপ। বেড়েছে নিশ্চিন্তভাবে হোটেল বোর্ডিং-হাউস সৈকতাবাস ভাড়াবাড়ি। গোপালপুরের সায়েবি আমল ছিলো, যা দীঘার নেই। দীঘার নমোনমো হ্যামিলটন সায়েব ছিলেন। আর গোপালপুরে ছিলেন, আছেন অজস্র সায়েবসুবো। দীঘায় ব্যারিস্টার কলোনি আছে, ফ্রেজারগঞ্জে ফ্রেজার সায়েবের স্মৃতি ঐ নামটুকুতেই।

জুনপুটে কিছু নেই। চাঁদিপুরে ময়ূর-ভঞ্জ রাজার ক্যাসুরিনা লজ আছে—রাজারাজড়ার স্পর্শ আছে আজও। এখন অবশ্য তা সরকারে বিন্যস্ত।

পশ্চিমবাংলার সমুদ্রের শুরু ডায়মনডহারবার থেকেই—ধরা যেতে পারে। সেখানে ট্রেন বাস দুটোই নিয়মিত পৌঁছয়। কলকাতা শহর থেকে ঐ দুরকম যানবাহনে দেড় ঘণ্টার বেশি লাগে না। সকালে গিয়ে সন্ধের ফেরা চলে। উপোসী শহর প্রতি উইক-এনড আর ছুটিছাটায় সমুদ্রের নুন খেয়ে আসে। সমুদ্র স্নানের অসুবিধে আছে। পিকনিকের জায়গা ছড়ানো। খাবার হোটেল খাপড়ার চালের। ইলিশের সময়ে ইলিশ আর গরমাগরম ভাত। ভাতে-ঝোলে সর্বত্র বালি। এবং এই বালি উড়ে এসে সমস্ত তীরের খাদ্যাখাদ্যে জুড়ে বসে। নিস্তার নেই। পি-ডবলু বাংলো একটা আছে পথের ধারে। ট্যুরিস্ট-আকর্ষক একেবারেই নয়। আর কিছু নেই। এই বছর কয়েক হলো সরকারি সাগরিকা'র দোতলা প্রাসাদ উঠেছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত থাকতে-খেতে পায় না। গোটা দিন চাপানি খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে সটকে পড়তে পারে এইমাত্র। তার জন্য মাথাপিছু কিছু পয়সা খরচ। মন্দের ভালো। অন্তত একটা কিছু হয়েছে এতোদিনে। এবং যা হয়েছে তার উপর খোদকারি চলতে চলতে একদিন সুবিধা-জনক কিছু একটা দাঁড়িয়ে ওঠার সম্ভাবনাও আছে।

এই কানামামা দিয়ে আমাদের সাগর-পরিক্রমার শুরু। হীরে-বন্দর থেকে বাসে এক ঘণ্টার কমে কাকদ্বীপ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অত্যন্ত দরকারি নাম। বড়ো গঞ্জ, যা নাকি দক্ষিণ-বাম সম্মুখ-পশ্চাৎ বিস্তৃত ভূমিকে ধরে রেখেছে। সমুদ্র নেই, তবু সমুদ্র-ছোঁয়া নদী আছে। নদীর গায়ে সুন্দর ডাকবাংলো আছে—সেচ দফতরের। নদীতে নৌকা আছে। পারঘাটা আছে। এছাড়া হাটের মাঝখানেই একটা যেমন-তেমন বাংলো। থাকার হোটেল

নেই। থাবার জায়গা অঢেল। সম্প্রতি কলকাতা থেকে সরাসরি বাসও হয়েছে।

এখন বিকেল তিনটে। কার্নিশে দুঃখিত বেড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি বসে আছি সমুদ্রের উপর হুমড়ি-খেয়ে-পড়া এক বাড়িতে। তার বারান্দায়। বাড়িটা কি সমুদ্রের নীলে তার মুখ দেখবে? অমন মুখ-দেখাদেখির খেলায় মেতে গোপালপুর সৈকতাবাসের প্রথম পংক্তি ধ্বংস হয়ে গেছে, মাথার চাল উড়েছে। কাঙাল দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে মৃত নিশ্চিন্ত সায়েবসুবোর স্মৃতি নিয়ে।

আজ থেকে ছ বছর আগে এসেও যাদের দেখে গেছি তারা আর নেই। এ্যাঙ্কোরেজ নামের বাড়ি গিলেছে সমুদ্র। ক্রিস্টোফার ভিলার সামনের ঝুলন্ত অংশ সমুদ্রের পেটে। অনেক কিছুই গেছে। অনেক কিছুই যাবে। তীরভূমির প্রথম পংক্তির এই ভাঙাচোরা আধ-খাওয়া বাড়ি ঘরদোর কিন্তু গোপালপুরেরই নিজস্ব। এমনটি আর কোথাও চাক্ষুষ করা যাবে না। অপরূপ এর সৌন্দর্য! মধ্যরাতে জ্যোৎস্নায় এই জবুস্থবু বাড়ির ইঠকাঠ পাথর কথা বলে। কী কথা বলে! কানের কাছে শঙ্খ চেপে ধরলে তা থেকে যেমন সমুদ্রের তীব্র গর্জন কানে আসে, এই বাড়ির পাথরে দেয়ালে কান পেতে রাখুন। কতো কথা শুনতে পাবেন। প্রথম দিনই এর ভাষা বোঝা যাবে না, কিন্তু দিনের পর দিনে তা পরিষ্কার হবেই।

এই ভাঙাচোরা সৌন্দর্য পরিচ্ছন্ন করার জন্যে লোকে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে আজ দেখলাম। ভাঙা দেয়াল ভেঙে শেষ করতে শাবল গাঁইতি হাতুড়ি পড়ছে গোটা দিন। এই নাকি নির্দেশ। কার নির্দেশ? সমুদ্রলক্ষ্মীর? এরপর যখন আসবো, যদি আসি, দেখবো ঝাড়াবোঁচা সমুদ্রতীর! রেলিং উঠিয়ে পাড় বাঁধানো। শিশুদের পারক আর গাড়ির গ্যারেজ, সিমেন্টের কৌচে মানুষের বসার স্থায়ী জায়গা—

পরপর পঞ্চাশ-ষাট। বুটজুতো পরে সমুদ্রদর্শীরা সমুদ্র দর্শন করছেন। একদিকে স্ক্যাণ্ডাল-পয়েন্ট অন্যদিকে ফুচকা ভেলপুরীর ঝাঁকা। নির্জন গোপালপুরের সেই ছবি কল্পনা করে মনে মনে আঁতকে উঠি।

কাকদ্বীপ থেকে নামখানা। বাসে ছোট্ট পাড়ি। মাছের বাজার। বাতাসে আঁশ উড়ে বেড়াচ্ছে। আঁশটে গন্ধ হাওয়ায়। সকালের দিকে যদি বা সহ্য হয়, দুপুরের রোদ খেয়ে বিকেল নাগাদ সেই চিমসেনি গন্ধে ভেদবমি উঠে আসবে। সামনে হাতানিয়া দুয়ানিয়ার ক্ষিপ্র জল। ব্রিজের প্রস্তাব বহুকালের। কাগজবন্দী হয়ে পড়ে আছে। কাজে আসেনি। ব্রিজ হলে ফ্রেজারগঞ্জ আর বকখালি দৈনিক-পর্যটক টানতো কম করেও দু-চারশ। তাতে লাভ হতো এই জলজঙ্গলের মানুষদের। চায়ের দোকান, ভাতের হোটেল, মাথা গোঁজার জায়গার ব্যবস্থায় যুক্ত হয়ে এই অঞ্চল পয়সার একটু মুখ দেখতে পেতো।

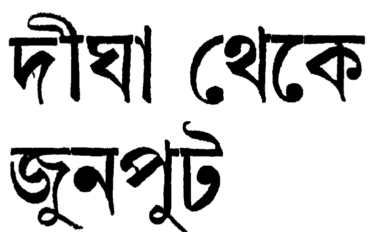
হাতানিয়া দুয়ানিয়া নৌকোয় পার হলে বাঁয়ে ডানে কিছু দোকানপাট। সরকারি বাস নেই। বেসরকারি বাস গোটা তিনেক। এই দু একমাস হলো নতুন পারমিট দেওয়া হয়েছে। বাস পারমিট-সুদ্ধ বসিয়ে রাখাও বেআইনি। এদিকে যেন উপযুক্ত দফতর একটু নজর দেন। বকখালি ফ্রেজারগনজের বিজ্ঞাপনে যে অর্থের সংহার হচ্ছে দিনের পর দিন সেই অর্থে থাওয়া-থাকার ন্যূনতম ব্যবস্থা হলে বাঙালি পর্যটক মাত্রেই খুশি হতেন। কলকাতা শহরের এতো কাছে এমন সাবলীল সমুদ্র আর নেই। ফ্রেজারগনজে সামন্তর হোটেলই ভরসা ছিলো। বাঁধের দক্ষিণে বনবিভাগের ছোট্ট বাংলো আছে সেখানে সাধারণ্যের ঠাঁই নেই। আর কলকাতা থেকে পঞ্চাশ ষাট মাইল দৌড়ে দমছুট, পিকনিকের নিমন্ত্রণ আমরা সরকারি প্রচারে দেখি আর স্তম্ভিত হই। গরমের দিনেও যদি দুয়ের বদলে চারকে বাধ্য হয়ে আটকে পড়তে হয়, তাদের মাথার উপর তারা-খচিত আকাশের চাঁদোয়াই ভরসা। কী খাবে কোথায়

শোবে—তার জন্যে যা ব্যবস্থা বর্তমান, তা বন্যাপীড়িত মানুষের হিসেবেও কম।

ফ্রেজারগনজে স্নানে নিষেধ আছে। বকখালিতে স্নান চলে। পিছনে দীর্ঘ বালিয়াড়ি, কেয়াঝোপ আর ছোট ছোট দু-চার-ঘরী গাঁ। টুকটাক মাছ ধরে। বাসের মাথায় সেই মাছ চাপিয়ে নামখানা, সেখান থেকে কাকদ্বীপ পৌঁছতে পৌঁছতে সে মাছ পচে ঢোল। বরফ নেই। মাছও তেমন অঢেল নয়। বাইরের ঘুমনে-অলা যে সামান্য মানুষ-জন আসে তাদের কাছে বেচে-বুচে দিলেই সাফ। সরকারি বেসরকারি কোনো উদ্যোগই এখনো পর্যন্ত দৃশ্য নয়; যাতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মাছ ধরা যাবে সমুদ্রে। মাটি ভালো না। নোনা জল লাগলে দশ মুঠি ধান দু-মুঠোয় গিয়ে দাঁড়ায়। অথচ, এমন পরিশ্রমী চাষীবাসী সমুদ্র আর তার নোনা বাতাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো মানুষ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় খুব বেশি নেই। আর তাদেরই পেটে খিদে, মাথায় আকাশ, সামনে সমুদ্রের হাহাকার। নারকেলকুঞ্জ সাফ। নতুন চারা লাগানো হচ্ছে। তটভূমি ভরে পড়ে আছে নানান আকারের পাথর।

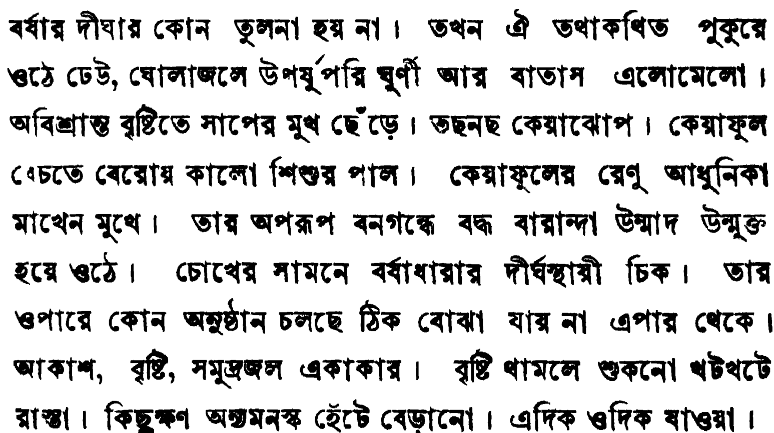
এক ধরনের এলোমেলো লতা গোটা তীরভূমির মাটি কামড়ে রেখেছে ফ্রেজারগনজে-বকখালিতে। শুনেছি এই লতা সুন্দরবনের বালির চাপড়া সমেত পোঁতা হয়েছে এখানে-ওখানে। এর বালুগ্রাসী শিকড় মাটির মধ্যে বহু দূর পর্যন্ত যায়। কামড়ে রাখে বালু। ছিনালি করতে দেয় না। বাতাসে উড়তে দেয় না পাগলের মতন। এ-লতার বাজারচালু নাম বালু চাপটি। ফুল হয় কলমীর মতন। পাতা গোল আর মোটা। দু-তিনটে লতা লাগালেই ঝাড়। দীঘায় এ লতা দেখিনি। চাঁদিপুরে আছে। পুরী গোপালপুরে নেই।

এককথায় এই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় সমুদ্রপাতী সৈকতাবাসের উন্নয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো—হাতানিয়া দুয়ানিয়া। তা পার হয়ে যানবাহন সমস্যা এবং কায়ক্লেশে সমুদ্রতীরে পৌঁছুলে মাথা গোঁজার যথেষ্ট জায়গার অভাব এবং সরকারি বেসরকারি পরিকল্পনার অবাস্তবতা বা দুর্দান্ত অবহেলা। হাতানিয়া—দুয়ানিয়ায় ব্রিজ হবে—আমরা দীর্ঘ দিন ধরে শুনে আসছি। গাড়ি পার করতে গেলে বার্জ দরকার। বার্জও খুব বেশি নেই। মনে থাকতে পারে, পুরনো হাওড়া ব্রিজের কথা অনেকেরই। বড় জাহাজ গেলে ব্রিজ খুলে নেওয়া হতো। হাতানিয়ায় বড় জাহাজের ব্যাপার নেই। বড় স্টিমারের জন্যে এমন ব্রিজ করা যেতে পারে—যা, প্রয়োজনমতো উঠিয়ে যাবার জায়গা করে দেওয়া যায়। সরকার পারলেন না। বেসরকারি ঠিকাদারকে দিয়ে এই ব্রিজ করা অসম্ভব নয়। তাহলে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ধমনীতে আরো কিছু অর্থবান রক্তের স্রোত বইতে পারে। 'সুন্দরবন উন্নয়ন প্রকল্প'-ও এগিয়ে আসুন। এ-ব্যাপারে এখুনি একটা কিছু করার দরকার।



দীঘা থেকে জুনপুট





বর্ষায় দীঘার কোন তুলনা হয় না। তখন ঐ তথাকথিত পুকুরে ওঠে ঢেউ, ঘোলাজলে উপর্যুপরি ঘূর্ণী আর বাতাস এলোমেলো। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে সাপের মুখ ছেঁড়ে। তছনছ কেয়াঝোপ। কেয়াফুল বেচতে বেরোয় কালো শিশুর পাল। কেয়াফুলের রেণু আধুনিকা মাখেন মুখে। তার অপরূপ বনগন্ধে বদ্ধ বারান্দা উন্মাদ উন্মুক্ত হয়ে ওঠে। চোখের সামনে বর্ষাধারার দীর্ঘস্থায়ী চিক। তার ওপারে কোন অনুষ্ঠান চলছে ঠিক বোঝা যায় না এপার থেকে। আকাশ, বৃষ্টি, সমুদ্রজল একাকার। বৃষ্টি থামলে শুকনো খটখটে রাস্তা। কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হেঁটে বেড়ানো। এদিক ওদিক যাওয়া।

ছোট্ট সিমেন্টের চাতালে চাল কলাই মুগের সঙ্গে ইলিশ আর চর্বিহীন পারসে। মুরগি ডিম আনাজকোনাজ সবই আছে। আর একদিকে আছে সবংএর চিত্র-বিচিত্র মাদুর, শাঁখাকড়ি দিয়ে যাচ্ছেতাই শিল্পকাজ। মাইক্রোফোনে রবীন্দ্রনাথের গান বন্ধ হওয়া খুবই জরুরী। ট্রানজিস্টার নিয়ে তীরে বসা বন্ধ হওয়া দরকার। ধর্মপ্রাণ বাঙালীর জন্যে চন্দনেশ্বর মন্দিরের দরজা আরো বেশী উন্মুক্ত করার প্রয়োজন।

চন্দনেশ্বর শিবের জাগ্রত মন্দির, প্রকৃতপক্ষে উড়িষ্যার ভিতরে। কিন্তু দীঘা থেকে তার দূরত্ব পাঁচ কিলোমিটার। সাইকেল রিক্সা আছে। এই জাগ্রত দেবতার নামে পশ্চিমবাংলা সরকারের কোন বিশেষ প্রচার নেই। জানি না কোন আঞ্চলিক অসুবিধা আছে কিনা। পুরীর জগন্নাথদেবের কোনো বিজ্ঞপ্তি লাগে না। তাঁর কোনো কাজ অবশিষ্ট নেই আর। তাঁর তৎপর হাতের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তিনি দীর্ঘ বিস্তৃত অপরূপ দু-চক্ষে শুধু চারিদিক তাকিয়ে দেখছেন। কিছু বলার নেই, কিছু করারও নেই। দর্শক তিনি।

চন্দনেশ্বর শিব দেখেন না। যদি আমরা তাঁকে দেখি, তাহলে দীঘা ধর্মপ্রাণ বাঙালীর উৎসব প্রাঙ্গণ হয়ে উঠতে পারে। সমুদ্রের টান বড়ো টান, কিন্তু, তার চেয়েও বড় টান দিতে পারে একমাত্র ধর্ম। দীঘায় তার সম্ভাবনা আছে।

আমি অন্তত বিশবার দীঘা গেছি গত চোদ্দ পনেরো বছরে। প্রথমবার এক সম্মেলনে। দুপুর নাগাদ মুড়ি চিবোতে চিবোতে পালিয়ে এসেছি আমরা কয়েকজন তরুণ বন্ধু। খাবার দাবারের কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। সকল সম্মেলনের শিকার হয়ে আমরা খড়্গাপুরের বাসে চেপে বসেছিলাম। অর্থাৎ কিনা উদ্যোক্তারা ভাবতেই পারেননি যে তাঁদের সম্মেলনে দিকবিদিক থেকে এতো শ্রোতা এসে পৌঁছুবেন। তাঁরা সময়ে আসায় অতিথিদের খাদ্যে টান পড়েছে। আজ অবশ্য দীঘায় এমন দৈন্যদশা নেই। বিস্তর হোটেল আর আবাসিক। সরকারি সৈকতাবাস ছাড়াও লম্বে দীর্ঘে চওড়া ট্যুরিস্ট লজ উঠে গেছে। লজের নিচে পানশালা। সায়েবি খানা। বাথরুমে পাখা। আর কী চাই? গরিবগুর্বো, ছাত্র যুবদের জন্যেও সস্তায় ক্যানটিন। সমুদ্রপিপাসু নিম্নমধ্যবিত্তদের জন্যে কটেজ। হাঁড়িকুড়ি বাসন বালতি সব আছে। বিছানা মাদুর মশারি আছে। শুধু জামাকাপড়ের পোঁটলার সঙ্গে একটা স্টোভ বেঁধে নিলেই স্বর্গ। সস্তায় থাকা খাওয়া। মশলা পেশার লোক পাওয়া

যাবে। কিন্তু, সেখানেও জায়গা, দরকার বা চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত কম। এবং আমার অভিজ্ঞতা বলে, এখন এই কবছরে দীঘার পর্যটক এতো বেড়েছে, সে-ব্যাপারে সরকারি বেসরকারি তেমন কিছু হয়ে ওঠেনি। আমি দেখেছি, গ্রীষ্মের দিনে ছুটিতে সিঁড়িতে সমুদ্রতীরে শুয়ে আছেন অসংখ্য পর্যটক। টেনটের ব্যবস্থার কথা ভাবা যায় না? প্রায় নিশ্চিহ্ন ঝাউবনে মাথা গুঁজে রয়েছেন অর্ধশত মানুষ খরগোসের মতন। ভাগ্যিস সাপখোপ মানুষকে ভয় পেতে শিখেছে।

দীঘায় যাবার সরকারি বাস ছাড়ে সকালে ধর্মতলা থেকে। হিজলী ট্রান্সপোরট ছাড়ে বিকেলে বাবুঘাট থেকে। সরকারি বাস খড়্গপুরের অনতিদূরে চা-পানি খাবার জন্যে বেশ খানিকটা সময় দাঁড়ায়। সেখানে টিন আর এ্যালুমিনিয়াম মিশিয়ে একচালা আছে। গরমে মানুষ সুস্থ হবার বদলে সিদ্ধ হয়। খড়গপুর থেকে দীঘার রাস্তায় ভাঙচুর আছে একথা ঠিক কিন্তু, এ-রাস্তায় মারচে যখন দুধারে লেলিহান পলাশ, তখন সে সৌন্দর্য এই অল্প বিস্তর ভাঙাচোরা আর অব্যবস্থাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে।

দীঘার পাড় ভাঙছে। বাঁধ দিয়েও তাকে রক্ষা করা যাচ্ছে না। তীরভূমির সৌন্দর্য ঝাউজঙ্গল একবারে শেষ। ডানদিকে বাঁদিকে দুদিকেই সমুদ্র দীঘার পত্তনিকে কুরে খাচ্ছে। দীঘা নদীর মোহনার দিকে যেতে যে ঝাউবন বীথিবদ্ধ ছিল তাতেও মড়ক লেগেছে। সমুদ্র সৈকতবাসের কোলের কাছে সরে এসেছে। আজ থেকে দু-বছর আগেও সমুদ্র যেখানে ছিলো, আজ সেখানে নেই। তীরভূমি ধরে কাঁকড়ার শিল্পকর্ম কলকা আছে, ভাঙাচোরা বাঁধ আছে, সেতু চওড়া আছে ঠিকই—কিন্তু পুরনো পত্তন দীঘার কপালে চ্যাড়া পড়েছে। তারের ভাঙন বন্ধ হচ্ছে না, দীঘার সমুদ্র বছরে

দু-তিনজন কিশোরের রক্তমাংস হাড় খাচ্ছে। বৃত্তি হিসাবে স্থায়ী মুলিয়া নেই। সরকারি ব্যবস্থায় দু-চারজন স্নান শেখাতে এসেছে সম্প্রতি—এইমাত্র।

মেদিনীপুরের এই কাঁথি-দীঘা এলাকার মানুষ স্বভাবতই আয়েসী। জানিনা কেন, এদের পুরুষমাত্রেই কলকাতার দিকে মুখ করে বসে থাকে। এক শ্রেণীর হাতে তুমুল পয়সা—তাদের জমি-জমা আছে, পুকুরে মাছ আছে, বরজে আছে পান, গোয়ালে গরু—সব আছে। এমনকি কলকাতায় ব্যবসা আছে। আরেক শ্রেণী, তাদের বাড়িতে দু বেলা দু মুঠো জোটে ভালোই—কিন্তু হাতে কাঁচা টাকা নেই। তারা কোথাও দপ্তরী, কোথাও বইপাড়ার বেয়ারা গেরস্থ বাড়ির কিশোর চাকর কোথাও, কোনখানে বা রাঁধুনি। আমি ইনসিওরেনসের বেয়ারা, মানে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, এমন একজনকে জানি যার বাড়ি ঘর-দুয়ার জোত-জমি পুকুর পুষ্করিণীর মোট আয়ে আমায় চাকর রাখতে পারে অনায়াসে। কিন্তু তারও দরকার কাঁচা টাকার। মাসে মাসে তার ভাষায়, কিছু না করে বা সামান্য ফাইলপত্র নেড়েচেড়ে যদি এতগুলো টাকা হয় তো ক্ষতি নেই কিছুই। যা আসে তার নাম বৃদ্ধি।

দীঘার দিন যদি যায় জুনপুট কি তার বদলে দাঁড়াতে পারে? কাঁথি থেকে জুনপুট সমুদ্রতীর। এ রাস্তায় বড় জোর গরুর গাড়ি যেতে পারে, মোটর ট্যাক্সি নয়। এবড়ো খেবড়ো রাস্তা। চাকার বারোটা বাজতে বাধ্য।

যেতে যেতে পথের দুপাশে গেরস্তবাড়ি, সবুজ মাঠ, পানের বরজ। রাস্তার পাশে মাছি-পিছলে যাওয়া গাইয়ের গা। এক যোড়া পালান। কাঁথি ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা গেলে তবেই বাতাসে আঁশটে গন্ধ। জুনপুট সমুদ্রতীরের সবচেয়ে নির্জন নাম। ছবির মতন ঝাউবন, এদিক ওদিক চতুর্দিক। চওড়া বেলাভূমি।

ডানহাতি পাকাবাড়ি। বাড়িতে লোকজন। মাছ বিভাগের আপিস তাদের সারবন্দী পুকুর জলাধারে। সেখানে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে। মাছকে ইনজেকশন দিয়ে গাভীন করা, ডিম ফোটানো—এইসব, সমস্ত। সুন্দর একটা যাদুঘর আছে সেখানে। আছে তিমি মাছের সাংঘাতিক চোয়াল। মাছ-মারিয়ের দল আছে সমুদ্রের গভীরে আর তীরে। সব আছে। শুধু সাধারণ, বাইরের লোকের জন্যে থাকার জায়গা নেই। কেন নেই? তার উত্তরও অবশ্য নেই। পশ্চিমবাংলা সমুদ্রতীরগুলোকে পর্যটক টেনে আনার জায়গা বলে মনে করেনি কখনো। হয়তো আজ করছে। কিন্তু আজ মানে কাল নয়। ভাবনাচিন্তা নয়, ফাইল চালাচালি নয়—সোজা হাতে কর্নিক নিয়ে নেমে পড়া। সিমেন্টের অনটন হলে বাঁশ আছে, বিলিতি মাটির চেয়ে মাখনের মতন পলিমাটি আছে, সুঁদরি কাঠ আছে, টালি আছে, ঝামা তৈরী আছে—নিখরচায় মাথাগোঁজার জায়গা করতে সাত থেকে দশ দিন। বাইরের লোকের হাতেও সে দায়িত্ব দেওয়া যায়। তখন দরকার মতো, একটি থেকে দুটি হবে, দুটি থেকে দশটা। শেষ পর্যন্ত উপকার দেশেরই। অন্য কারুর নয়। এ কথাটা মনে রাখার দরকার সকলের আগে।

বাঘাভেড়া থেকে বিদ্বিশা সঙ্গে গয়নাবড়ি

খড়্গপুর থেকে দীঘা রোড ধরে দশ-এগারো মাইলের মাথায় পড়বে নারাণগড়।

পিচ রাস্তা থেকে ডাইনে সুরকি-মরাম ঢালা পথ। খাঁ খাঁ মাঠ এখন দুদিকের। সামান্য গেলেই বাঁ দিকে এই আশ্রম। না কোনো ঘর-পালানো ধর্মের সঙ্গে এর যোগ নেই। ঘর গড়ে ফুল

ফুটিয়ে ফলের গাছে জল ছিটিয়ে, সুখে-শান্তিতে, আলো-বাতাসে অবগাহন করে এখানে বাস করছে অর্ধশত আশ্রমিক কিশোর-কিশোরী। এ বছরে তাদের মধ্যে থেকে এই প্রথম পাঁচ-জন ছাত্র স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বসছে।

পনেরো-ষোল বিঘে জুড়ে নয়নভোলানো এই আশ্রম। 'বিদিশা' এর নাম। গাছ-পালা ফুলে-ফলে ভরা, থৈ থৈ পুষ্করিণী সাজানো-গোছানো পথঘাট। গাছতলায় বসার বেদী পড়ুয়াদের। বর্ষা ছাড়া সাধারণত এরা স্কুলের পাঠ পায় ঘরে বাইরে, মাঠে, ছায়ায়। নবীন শান্তিনিকেতনের পরাগ লেগে আছে এর চোখে-মুখে যেন মনে হলো। নিজেদের ধানজমি আছে কিন্তু ধানে কুলায় না। ফসলের ক্ষেত সম্বচ্ছর মুখর। আলু পটল ঝিঙে বেগুনে ভর্তি। সবচেয়ে যে কথাটা এখানে বড়ো তা হলো এরা নিজেরাই সব করে। চাষবাস, ধোয়ামোছা, রান্নাবাড়ি এবং তার সঙ্গে পড়াশোনা; গান নাটক খেলাধূলা সবই আছে। আশেপাশের গ্রাম থেকে চার পাঁচজন পড়ুয়া আসে। বাকি সবই এখানে থাকে, খায়-দায় লেখাপড়া করে। কলকাতা থেকে আছে দু-ভাই। বর্ণ হিন্দু ঐ দু-তিনজন। বেশির ভাগই আদিবাসী—বিশেষত লোধা উপজাতির ছেলেমেয়ে। এই সেই উপজাতি যারা চুরি ডাকাতিতে অভ্যস্ত, তৎপর, উগ্রস্বভাব, সভ্যতার সুখস্পর্শহীন।

এই আশ্রমেরই প্রান্তে রেললাইন। পার হলে লোধা উপনিবেশ বিদিশার মেয়েদের হস্টেল, জুনিয়ার স্কুল। পরিচ্ছন্ন বাড়িঘরের সামনে ফলন্ত ক্ষেতখামার। সবুজ দেখে চোখ জুড়োয়। এককালের যাযাবরেরা ঘর বেঁধেছে। দেওয়ালে সাঁওতালি-নকশা। এখানে-ওখানে কালো রঙের জীবন্ত ছেলেমেয়ে। এদের সবাই ক্ষেতির কাজ করে। আশ্রমের নানান কাজ করে। সরকারি সাহায্য কিছু আছে এদের পেছনে। তবু এদের পুনর্বাসন, দেখাশোনা, লালন-পোষণ সব দায়িত্বই বিদিশার। এরা বিদিশারই লোক।

উপনিবেশে যাবার পথ এরাই গড়েছে। দুধারে বসিয়েছে গাছ। গুলমোহর সোনাঝুরি, এক জাতের চেরি। সেই চেরির ডালপালা নুয়ে পড়েছে ফুলে আর ভ্রমরে।

১৯৫২-তে নমোনমো পত্তন এর। এখন ফুলে-ফলে সৌরভে ভরপুর। এদের কেউ শেখে কাঠের কাজ, কেউ শেখে তাঁত। আমিও লোভ সামলাতে না পেরে একটা রঙিন গামছা আর বেডকভার কিনে নিয়ে এলাম।

বিদিশার পশ্চাদপটে যারা হাল ধরে আছেন শক্ত হাতে তাদের একজন ডঃ প্রবোধ ভৌমিক আর অন্যজন প্রাক্তন আই জি রঞ্জিত গুপ্ত। সংস্থাটি চালায় ট্রাস্ট। গ্রামের এ প্রান্তরটার নাম ছিলো বাঘাভেড়া। সেই বাঘাভেড়া থেকেই এই আজকের বিদিশা।

গয়নাবড়ি

ঝোলে ঝালে অম্বলে এখনো সমানভাবে বড়ির চলন বাঙালীর রান্নায়। অম্বলের জন্যে মুসুর ডালের বড়ি। ভাজা খাওয়ার জন্যে পোস্তর বড়ি। বাকি বড়ি বিউলির ডাল থেকে বানানো। ডালের সঙ্গে চাল কুমড়ো চেঁছে মিশেল দেওয়া হয় কখনো-সখনো। প্রথমে পরিষ্কার ন্যাকড়ার মধ্যখানে বুড়োবুড়ি গড়া হয়। নাকের ডগায় ধানদুব্বো গুঁজে দিয়ে, একটু বড়ো মাপের, যেন অন্যান্য বড়ির সংসারের পাহারায় থাকছে ওরা—এমনভাবে মা-ঠাকুমা আর বেওয়া পিসি-মাসি শুদ্ধ কাপড়ে স্নান সেরে বড়ি দিতে বসতেন। আধুনিক সংসারে আজো বড়ির প্রচলন আছে, কিন্তু সেই বড়ির বেশির ভাগই আসে বাজার থেকে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কিছু বুড়ি এখনো দক্ষিণ কলকাতার বাজারে এরকম বড়ি বেচে অন্নসংস্থান

করে। এককালে এই বেওয়া-বালতি বুড়ি তকলিতে সুতো কে পৈতে বানিয়ে বিক্রি করতো। এখন পৈতে পুড়িয়ে সব বামুন ব্রহ্মচারী। বড়ির দিনও ঘনিয়ে আসছে।

বড়ি যে এক আশ্চর্য গৃহস্থ শিল্প তার পরিচয় মেদিনীপুর জেলায় তমলুক মহিষদল. সুতাহাটা, দাঁতন প্রভৃতি অঞ্চলে এই গয়নাবড়ি পাওয়া যায়। গয়নার কলকা থেকে বাড়ির মেয়েরা এই বড়ি তৈরি করে। মেদিনীপুর জেলায় এই সীমাবদ্ধতার কারণ আমি খুঁজে পাইনি এবং বাংলাদেশের অন্য কোন জায়গায় এই গয়নাবড়ির থেকে সন্ধান পাইনি আমি। নানান আকারের সূক্ষ্ম কাজ—জালি-কাটা কাজ চন্দ্রমালার মতন, কোনোটি কানপাশার মতো—বেশ বড়োসড়ো। অত্যন্ত যত্নে একটির সঙ্গে আরেকটিকে পাতা বা ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে আলাদা করে হাঁড়ি তিজেলের মধ্যে রাখা হয়। ভয় বর্ষার জলো হাওয়ার। এমন সুন্দর সূক্ষ্ম কাজ, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না বিউলির ডাল অনেকক্ষণ ধরে ফেটিয়ে এক ফোঁটা জলে ফেলে দেখতে হবে ভাসে কিনা। যদি ভাসে তাহলেই বোঝা যাবে, ফেটানো ঠিক হয়েছে। তারপর সেই লেই কাপড়ে বেঁধে, কাপড় ফুটো করে পিতলের নল গুঁজে দিতে হবে। তারপর চাপ আর দরকার-মতো হাত ঘুরানো। জিলিপির মতন প্যাঁচ পড়ে বলে অনেকে একে জিলিপি বড়িও বলে। মেদিনীপুরে মাহিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এই শিল্প সীমাবদ্ধ। এরও কোনো কারণ আছে কিনা জানা যায় না। শীতের সময়ে এই বড়ি দেওয়া হয়। বাতাসে জলের ভাগ কম থাকে বলে, বড়ি তাড়াতাড়ি শুকোয়। কাপড়ে পোস্ত ছড়িয়ে বড়ি দেওয়া চলে যাতে কাপড় আটকে না যায়। আটকে ভেঙে গেলে গোটা আয়োজনই নষ্ট। বাড়িতে অতিথি এলে এই বড়ি ভেজে পিরিচে সাজিয়ে দেওয়া হয়। সে এক রমণীয় দৃশ্য সন্দেহ নেই। না খেয়ে অতিথি সেই গয়না বড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে।

গেঁওখালি ডাকবাংলোয়

একটু ঘুরতে-ঘুরতে জায়গাটায় পৌঁছুই। বলতে-কইতে মেদিনীপুর জেলা। আসলে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার নুরপুর হুগলি পয়েনটে এসে দাঁড়ালে একটি নদীর ফারাক এবং নদী আকারে বড় কম না। নদীর নাম হুগলী নং। অর্থাৎ ভাগীরথী, গঙ্গা। এর সঙ্গে এসে মিশেছে রূপনারায়ণ, পুরুষ নদী। এই গেঁওখালিতে পুরুষ আর রমণীর মিলন ঘটেছে। আর কয়েক পা এগোলেই সাগর। দূরে চকচক করে জাহাজ। এখান থেকে জাহাজের বাঁশি শোনা যায়। সাগরের হাওয়া গায়ে কেটে বসে।

মোটর বোট জলে পায়চারি করে। পাশ-উঁচু নৌকা ভর্তি করে হোগলা, নারকোল, ঝাঁটার কাঠি, আর নৌকো বাঁধার কাতার দড়ি। দড়ি না বলে কাছি বলাই উচিত। এরা যায় ডায়মনড-হারবার, কাকদ্বীপ আর শহর ধরতে গণ্ডাখানেক ঘাটে। মাঝেমধ্যে নৌকো উলটোয়। জলে ভাসন্ত ঝাঁটার কাঠি গেঁওখালির গঞ্জের কিনারে শুকোতে দেওয়া হয়, অঘ্রাণের মাঠে শয়ান ধান-গাছের মতো, গুচ্ছ গুচ্ছ।

মাটি আর হাওয়া দুটোতেই চটচটে নুন। জল খেয়ে জল হজম করা কঠিন। মানুষের গায়ের রং কালো। গঞ্জে ল্যাটা মাছ আর কুচো চিংড়ি ছাড়া কিছু নেই। ইলিশ এখন বলতে গেলে ওঠেই না। উঠলে এক কেজির কম, দাম চোদ্দ। সবজির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বেগুন। পঁচিশ পয়সা কিলো। শহরেও দাম চল্লিশ। সুতরাং বাজার মেলে না, ভালো মাছ কলকাতা খায়। আর খায় হলদিয়া। চাল সস্তা। মাংসের দোকান একটাই। লঞ্চঘাটা আছে। হুগলি পয়েনট থেকে বিশ পয়সার টিকিট

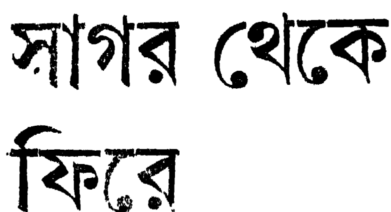
আমি ঘুরতে ঘুরতে প্রথমে তমলুক। তমলুক থেকে মেচেদা সেখান থেকে মহিষাদল ডানে রেখে গেঁওখালি পৌঁছেছিলাম। পথটা ঘুরপথ। তবে দেখতে-দেখতে যাওয়া গেছে এই যা। নদীর ধারে ইরিগেশন বাংলো। দোতলা দু'পাশে খোলা ছাদবারান্দা। সামনে নদী। গাছপালার আড়াল নেই। পাড়ের ওপর, বাংলোর সামনে বাঁধানো চাতাল। চাতালের ছাতা একটি ছাতিম গাছ। পাড় ধরে সারবন্দী কৃষ্ণচূড়া। বাংলোর বাগান। মরশুমি ফুল থই থই করছে। বাঁহাতি সামনে কালো জলের বিশাল পুকুর। পিছনে চৌকিদারের আস্তানা। গ্যারেজ। গেঁওখালি আগে বন্দর ছিল এখন মরা-বন্দর। বন্দরের পুরনো ঘাট-নদী খেয়েছে, পুলিস চৌকী খেয়েছে। গঞ্জ ভরতি শুধু গুদোম আর গুদোম। তাতে নারকোল, হোগলা রশির সঙ্গে গরান কাঠের বল্লা আর গুড় বোঝাই। অভাবে দাম উঠবে বলে দরজা বন্ধ।

মহিষাদল থানার দুটো মৌজা—সুখলালপুর আর বেতকুণ্ড। এরই চলতি নাম মীরপুর—খৃষ্টানপাড়া। আঠারো শতকের কথা, মহিষাদলের রাজা আনন্দ উপাধ্যায়, কেউ বলেন তাঁর স্ত্রী জানকী দেবী বর্গী আক্রমণ ঠেকানোর জন্যে একদল পর্তুগীজ সৈন্যকে এই মীরপুরে স্থায়ী বসবাস করার ব্যবস্থা করে দেন। অনেকেই জানেন, এক সময় হুগলী থেকে সপ্তগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল এদের দখলে ছিল। সৈনিক হিসেবে এদের ছিল দারুণ নামডাক।

বয়স্কদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারছি, এঁরা নাকি ব্যাণ্ডেলের পর্তুগীজ উপনিবেশ থেকে এসেছিলেন। এঁরা মানে এঁদের পূর্ব-পুরুষেরা। কিন্তু জনশ্রুতি ছাড়া, এ বিশ্বাসের কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। শাদা চামড়া আর নীল চোখ নিয়ে এদের কোনো অকারণ গর্ব নেই। আগেও যেমন, এখনো তেমন এদেশীয় মেয়ে বিয়ে করেছেন, ঘরগেরস্থালি পেতেছেন। পোষাক-পরিচ্ছদ আচার ব্যবহারে সাধারণ গ্রাম-বাসীর সঙ্গে প্রভেদ কিছু নেই। শুধু নামে

ছাড়া। নামে এরা কেউ মার্টিন, জোসেফ, জন, মানুয়েল, ফিলোমিনা, মারিয়া, ইভা, অ্যাগনেস কেউ আবার রতন, হরনাথ, নলিনী। দুটি গীর্জা আছে। প্রোটেসটানট আর ক্যাথলিক। কুটিরের মতন চেহারা। কবরখানা আছে। সেখানে দুই সম্প্রদায় পাশাপাশি। ডাক্তার মিসেস কাদম্বিনী আচার্য এখানে শুয়ে আছেন। তাঁর ফলক, থেকে জানা যায় তিনি ১৯০৯ খ্রীঃ ২৬ মে এখানে সমাহিত হয়েছেন। তাঁর অন্য পরিচয় তিনি পশ্চিম বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথ মুখার্জীর শাশুড়ি ঠাকরুন। তিনি মহিষাদল রাজবাড়ির লেডী ডাক্তার ছিলেন একদা।

ঘরবাড়ি সাজানো আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দেখে সাধারণ গ্রামের লোক থেকে এই মীরপুর-গৃহস্থদের আলাদা করা অনায়াসেই যাবে। জানলা দরজায় রংচং-এ পর্দা। বিছানায় পাতা আধুনিক বেডকভার। বৈঠকখানায় চেয়ার টেবিল। ট্রানজিসটার আছে ঘরে ঘরে। পেশায় অধিকাংশ কৃষিজীবী। চাকরি করেন, এদের সংখ্যাও কম নয়। জাহাজের কাজকর্মে অনেকেই বাইরে যান। সারেঙ্গ, কুক, বাটলার—এ কাজে যথেষ্ট সুনাম আছে এই মীরপুর বাসিন্দাদের। ইস্কুলে পড়ান কেউ কেউ। যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার কম নয়। গেঁওখালি থেকে দু মাইল হাঁটাপথে পড়বে মীরপুর পর্তুগীজ গ্রাম। যে কেউ গিয়ে গোটা দিন কাটিয়ে সন্ধের আগে কলকাতা ফিরতে পারেন।







ফেরার আগে যাবার কথায় আসি। যেতে না হলে আর ফেরা কোথায়, ফেরা কোথা থেকে? আজ যেখানে চলেছি, সেখানে আগে কখনো যাইনি। যাবার কথা ভেবেছি, যাওয়া হয়ে ওঠেনি। জীবনে অনেক মেলায় গিয়েছি। অনেকবারই গিয়েছি। তার সঙ্গে এ-মেলার তুলনা হয় না। এখানে মানুষ একবার গিয়ে পৌঁছনোর জন্যে ভাবে। বারবার নয়। এখানে পুণ্য সঞ্চয় করার কথা ভাবতে নেই। পাপক্ষালন যাতে হয়, সেই ভাবনা। ভাগীরথী আর সাগর যেখানে মিলেছে, সেখানে সাষ্টাঙ্গ লুটিয়ে পড়া। প্রণিপাত, তর্পণ, গোদান, ব্রাহ্মণ-ভিক্ষুকে দান—তারপর মুনিজীর পূজা। মকরবাহিনী গঙ্গার পূজা। গঙ্গার কোলে ভগীরথ। মুনিজী মধ্যবর্তী। তাঁর দক্ষিণপ্রান্তে ভগারথের পূর্বপুরুষ সগর রাজা, পাশে দণ্ডিত যজ্ঞাশ্ব। রাঙা উজ্জ্বল মূর্তিগুলি নতুন মন্দিরের বারান্দায় সমুদ্রের দিকে পিছন ফিরে সামনে লক্ষ লক্ষ ভক্তের পানে তাকিয়ে আছেন। চোখে পলক নেই। এই দৃষ্টির মহান রূপ দেখেছি জগন্নাথদেবে। সেখানেও তিনি দাঁড়িয়ে আছেন নিষ্পলক। মুখমণ্ডল ছাড়িয়ে সেই তাঁর দুই

বিপুল চোখ জগজ্জাবনের দিকে। কোনো কাজ নেই যেন তাঁর। শুধু দেখা। কাজ নেই। কারণ কর্মব্যস্ত হাতদুটিও নেই। তিনি রাখেননি।

আজ সাগরে পৌঁছনোর প্রধান পথ নামখানা। নামখানা চেমাগুড়ি ছয়ের ঘেরী হয়ে সাগর। কাকদ্বীপ কচুবেড়িয়া। মেদিনীপুরের নানা জায়গা থেকে নৌকায়। নৌকা জলে ভাসে। নৌকার উপরে বাতাসে ভাসে পাল। পালের উপরে উর্ধ্বমুখী পতাকা। বায়ুস্তর ভরে যায় ভক্ত কণ্ঠস্বরে: জয় কপিলজী, জয় মুনিজী, জয় গঙ্গামায়ী।

আমরা নামখানা পৌঁছে সোজা সাগরে যাবার বায়না ধরলাম। কারণ, চেমাগুড়ি হয়ে যেতে সময় লাগে। ওখান থেকে যাবার বাহন বলতে সরকারী আনুকূল্যে জিপগাড়ি। পিঠে মালপত্তর কম না। ছয়ের ঘেরী থেকে মেলার জন্যে একটি হাঁটাপথ সবে খোলা হয়েছে। তীর্থযাত্রীরা সে পথেই চলেছেন, হাজারে হাজারে, সারবন্দী। আমরা দ্রুত পৌঁছুবো, অনায়াসে পৌঁছুবো। এটি চাই। নামখানায় ঘণ্টা তিনেক বসে। যাবার ব্যবস্থার দেরি হচ্ছে। মেলা পরিচালকদের কেউ কেউ বলছেন, ওই দেখুন ঝাউয়ের মাথা দুলছে। দক্ষিণে বাতাস শুরু হয়েছে হঠাৎ। লঞ্চ সাগরে যেতে পারবে না। দারুণ রোলিং হবে। আপনারা বমি করবেন। অসুস্থ হয়ে পড়বেন। বিপদ আছে। সারেঙরা সাফ 'না' করে দিলেন। আমরাও নাছোড়। শেষপর্যন্ত লঞ্চে উঠে সাগরের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেওয়া হলো প্রথমে হাতে-পায়ে ধরে, বাবা-বাছা বলে এবং পরক্ষণে ভয় দেখিয়ে। সারেঙ আর লঞ্চের আপন লোকজনদের তুলনায়, দল আমাদের জবরদস্ত। শেষ অস্ত্র ছাড়তে হলো বলে আমরা কেউ কেউ দুঃখিত হয়ে বসে থাকলাম। নদীর দিকে চেয়ে, নদীতীরের বাইনের ঝোপঝাড়ের দিকে তাকিয়ে। জল কেটে লঞ্চ এগুলো সাগরের দিকে। সাগরের মেলা অভিমুখে।

ছুটির ঝাড়গ্রাম

আমাদের জিপ ঝাড়গ্রাম পৌঁছুলো ভরতপুরে। থাকবো কোথায়? খবর একটা দেওয়া ছিলো। কিন্তু আমাদের কাছে উত্তরে হাতচিঠি জমা পড়েনি। তবে ভয় নেই। সঙ্গে যিনি আছেন, তিনি এককালে এই জেলা বছর দুই শাসন করে গেছেন। দুষ্ট-শাসন। সুতরাং তাঁর ওপর বরাত দিয়ে মেদিনীপুর শহর থেকে বালবাচ্চা প্রসঙ্গ পরিজন নিয়ে ভেসে পড়েছি, লক্ষ্যহীন। স্থিরস্থায়ী লক্ষ্য কিছুকে করিনি। ভেসে চলেছি, এখান থেকে ওখানে। আজ থেকে কাল। পুজোর ছুটির মুখোমুখি কটা দিন এর মধ্যেই সাঙ্গ।

মেদিনীপুরে সার্কিট হাউসে ছিলাম। আসার পথে হলদিয়া মহিষাদলও সারা। তমলুক থেকে মেদিনীপুর শহরে। সেখান থেকে শালসেগুনের বনাঞ্চলে ঢুকে পড়েছি এখন। সেগুনমঞ্জরীর গন্ধে বাতাস ভারি। বেশ ঠাণ্ডা আছে।

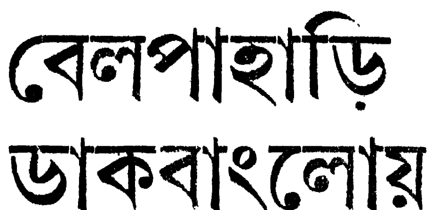
রোদে পিঠ দিয়ে ঘোড়াধরা বাংলোর বারান্দায়। আজকে আর রান্নাবান্নার ঝামেলা নয়। শান্তিনিকেতন বোরডিং-এর খাবারের খ্যাতি অনেকদিনের। আগেও বেশ কয়েকবার খেয়েছি। ওখানে মাসচুক্তিতে থাকার ব্যবস্থাও আছে। একবার একদিনের জন্যে থেকেওছি। ঠিক হলো, ওখান থেকে খাবার আসবে। মাছ ভাত ডাল ভাজা। সুক্তো পেলে তো কথাই নেই। শেষপাতে চাটনি। মাঝখানে বোধ হয় কাঁটা দিয়ে একটা ছ্যাচড়া ঢুকে গিয়ে থাকবে। দই মিষ্টি। রাজভোগের ব্যবস্থা একেবারে, এই বাংলোটা ভারি মজার। শালসেগুন জঙ্গলের মধ্যে ছোট্ট এই বাড়ি। সামনে ফুলের বাগান। পিছনে সবজি। চৌকিদারের ক্ষেতে ভর্তি পেঁপে ঢেঁড়শ কলা পুঁই। মাচায় উচ্ছে। রাস্তা টুকটুক উচ্ছে লঙ্কা। বাংলোর সামনে পুলিশের থানা। লোধাদের চুরিচামারির ভয়

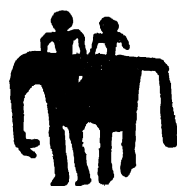
নেই। এখানে এই ভয়টা প্রতি গেরস্তের। ছিঁচকে চোর। কিন্তু চোর বটে।

বাংলোয় খাওয়াদাওয়া সেরে, একটু গা ছাড়িয়ে আবার ছুট। বেলপাহাড়ির দিকে যাই। আগেও বারকয় গেছি। তবু সেখানে যাবার টান কমেনি। কিছু কিছু জায়গা আছে, কখনো পুরনো হবার নয়। পুরনো হয় না।

ওখানে বনবিভাগের চমৎকার বাংলো—তৈরিকরা জঙ্গলের মধ্যে। তবে, সেখানে জায়গা পাওয়া কঠিন। আগেভাগে ব্যবস্থা করলে হতো। তবু চেষ্টা হবে। না পেলে ঘোড়াধরা তো আছেই। যেতে আসতে দেড়ঘণ্টা, বিনপুর হয়ে।

এবার আমাদের সঙ্গে মোট দুটো জিপ। ঝাড়গ্রামের দুই বন্ধুর অতিথি আমরা, বেলপাহাড়ি অভিমুখে। ওদের কাঠগোলা ওখানেই। রসিক মানুষ। বলল, একটু মুরগির ঝোলভাত আমাদের ওখানে সেরে নিতে হবে কিন্তু। ব্যবস্থা করাই আছে।





পথের সৌন্দর্য বলে বোঝানো যাবে না। দুপাশে ক্ষেত আর সাঁওতাল গাঁ। হঠাৎ হঠাৎ চাপড়া চাপড়া জঙ্গল টিলা ধারাবাহিক অরণ্য বেলপাহাড়ির মাইল কয়েক আগেই শুরু হয়ে গেল। সেই বনের মধ্যে দিয়ে ক্রুদ্ধ সাপিনীর মতন সুবর্ণরেখা। দুর্গম বন। একসময় এসব জায়গায় নকশালদের ঘাঁটি ছিলো। বাংলা বিহার উড়িষ্যার সীমান্তে ঐ বিপুল জঙ্গল। একরাজ্যে তাড়া খেয়ে অন্য রাজ্যে সহজেই সটকে পড়া যেতো। ওরাও করতো তাই। চম্বলের মতন টেরাইন। সেকারণেই পুলিশ বা দমনকারী দলের বিশেষ জারিজুরি খাটতো না। দূর থেকে দেখতে অতিসুন্দর। সৌন্দর্যের মধ্যে অকল্পনীয় ভয়ংকর লুকিয়ে আছে। শুনে বিশ্বাস করা শক্ত।

যাই হোক, বেলপাহাড়ির ডাকবাংলোর তিনটা স্যুইটই ভর্তি। সুতরাং ফিরতে হবে। আমরা পৌঁচেছি বিকেল নাগাদ। পৌঁছেই বাংলোর চত্বরে ঢুকে গেছি। শাল সেগুন চাঁপ পিয়াল চাষ করে এই নতুন বন, বছর কয়েকের। আমগাছ জামগাছ আছে। ইউক্যালিপটাস আর সোনাঝুরি। ঝাউ আর শিরীষ। বনের মধ্যে ঢুকতেই একটা তীব্র মিষ্টি গন্ধ নাকে এলো পেট্রোলের গন্ধ ছাপিয়ে। কীসের গন্ধ? তাত লেগেছে সেগুনমঞ্জরীর গায়ে। তার

সঙ্গে মিশেছে অজানা বনগন্ধ। মরামের পথ দিয়ে ধীরে আমাদের জিপ গড়িয়ে এসে থামলো বাংলোর গেটে। নেমে পড়লাম। চায়ের ব্যবস্থা হলো। সঙ্গে সিঙ্গাড়া। বাচ্চারা কিচিরমিচির লাগিয়েছে। ডালপালার পাখি তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছে। আমরা ঘাসের সতরঞ্চিতে বসে চারিদিকের স্নিগ্ধতা গায়ে মেখে নিচ্ছি।

আমি এর আগেও বেলপাহাড়ি এসেছি। তবে ঠিক এই সময়টায় নয়। মনে পড়ছে, রাস্তার পাশেই গভীর রাতে পারাপারহীন এক মাঠে নেমে পড়েছিলাম। দুই বন্ধু। সামনে ধু-ধু করছে মাঠ। কুয়াশায় জ্যোৎস্নায় সে এক জন্মান্তরের হাতছানির মতন। অলৌকিক, অবিশ্বাস্য। মাথার ওপরে গোল ঝুলন্ত চাঁদ। এতো বড়ো চাঁদ যেন জীবনে দেখিনি। নামছে। নেমে আসছে। মনে হয় এক সময় বুঝি পথ জুড়ে দাঁড়াবে। বলবে, থামো। হেঁটেছো অনেক। এখন স্তম্ভিত পাথরের মতন দাঁড়াও।

আমরা কী এক রহস্যের টানে ভেসে চলেছি। কখনো মনে হচ্ছে, এ এক অবিশ্রান্ত সাঁতার জলে, সমুদ্রের মৌনে। কিন্তু, তা কী করে হবে? জীবনানন্দের সেই মহীনের ঘোড়াগুলির এই প্রান্তরে চরার কথা। আমরা ভোর হলে থামতে পেরেছিলাম। জানিনা, এখনো সেই পারহীন প্রান্তর আছে কিনা? কিংবা, তা বুঝি ছিলো সেদিনের স্বপ্নে, ঘুমে, হিমঘুমের মধ্যে স্বর্গীয় জাগরণ! আজ আর তার খোঁজ করেই বা কী লাভ?

আজও জ্যোৎস্না বড় কম না। কাছেই লক্ষ্মীপুজো। চাঁদ গোল হতে শুরু করেছে।

আকাশ থেকে ঝুলে আসছে, মাটির টানে। এক আকাশ তারা আক্রমণ করছে আমাদের। জঙ্গলে শীত। আমরা

গায়ে গলায় কাপড়-চোপড় জড়িয়ে জিপ থেকে নামলাম। কয়েক কদম এগিয়ে, মনে হলো, একটা কাঠের দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। চারিদিকে কাঠের পাহাড়। কাঠের মদগন্ধ। কাঠের পাবড়ার মোটা পাঁচিল। চারিদিকেই কাঠ আর কাঠ। কাঠ ছাড়া কিছু নেই। মাঝে মধ্যে ফাঁকা জমি। একপাশে চেরাইকল। এখন আর চলছে না। বন্ধ। সন্ধের পর আমাদের দুজন বন্ধু টর্চ জ্বালিয়ে পথ দেখাচ্ছে। দরকার ছিলো না। চাঁদের আলোয় সবকিছুই পরিষ্কার।

একটা মাটির বাড়ির সামনে দাঁড়ালাম। ঝকঝক করছে। উঠানে দাবায় চ্যাটাই পেতে কেউ, কেউবা খাটিয়ায় ঝুপঝাপ করে বসে পড়লাম। ঘরের ভেতরেও দু দুটো চৌকিপাতা। ধবধবে বিছানা।

ওরা বললো, আমরা এলে থাকি। মুশকিলের মধ্যে ইলেকট্রিক নেই।

বললাম, থাকলে তো আরো মুশকিল হতো। এখানে ইলেকট্রিক বেমানান।

এসে যাবে একদিন। বাড়িঘর দোর ইতিমধ্যেই অনেক বেড়েছে। দোকান পাট হাটবাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্র। লোকজন প্রচণ্ড ভাবে বেড়ে গেছে এই ক বছরে। বিরাট একটা কারখানা খাড়া হয়ে উঠেছে অল্পদূরে।

এককালে মেদিনীপুর জমিনদারির অধিকারে ছিলো এই অঞ্চল। যে বিশাল বাড়িটা এখন ব্লক অফিস, তা ছিলো জমিদারের সেরেস্তা। নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষও দেখে এসেছি। নীলের চৌবাচ্চা। এখন সাপখোপের আস্তানা। এ সমস্তই আগেকার দেখা।

আমরা বসে বসে গল্প-গাছা করছি। এই গত বছরেও পাহাড় থেকে হাতির পাল নেমেছিলো। মাইল দুই গেলেই গভীর বনজঙ্গলের শুরু। সেই পথ ধরে আরো অনেক মাইল গেলে কাঁকড়াঝোড় ডাকবাংলো। ওয়াচ-টাওয়ার আছে। তার উপর উঠে বুনো জন্তু-জানোয়ার দেখা যেতে পারে। বিস্তর হাতি। ভাগ্যে ছোট বাঘের দেখা মেলে। হরিণ আর বুনো শুয়োর প্রচুর। পাখি। পাইথন।

শীতেই যেতে হবে। জিপ ছাড়া যাবার উপায় নেই। তাও গাইড সঙ্গে থাকা জরুরী। জঙ্গলে অজানা পথ মৃত্যুকূপের সামিল।

ভাত মুরগীর ঝোল আর কোঁড়ক ভাজা। কোঁড়ক হলো ব্যাঙের ছাতা। যে জানে বেছে নিতে পারে। কিছু কিছু বিষাক্ত ছাতা আছে। খেয়ে মরে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে।

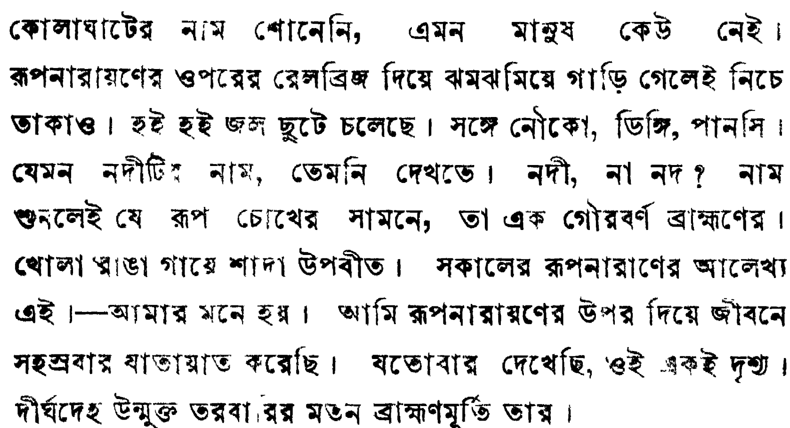
সবাই ভয় পেলো। অনেকেই খায়নি জীবনে। কিন্তু আমি তো জানি, কী অসামান্য স্বাদ এই ছত্রাকের। বাঁচি-মরি গালে ফেলে দিলাম। এর আরেক নাম 'স্বর্গপুষ্প'—অমৃতের আস্বাদ এর হবে না তো কী কুঁকড়োর ঝোলে হবে?

মাঝরাতে ফিরলাম ঘোড়াধরায়। ফিরতে মন চাচ্ছিলো না। ওদের বলে এলাম, বাংলো ছার, একবার একা এসে এখানে কটা দিন নিজের মুখোমুখি কাটাবো।



দেনাং বাংলোয়





কোলাঘাটের নাম শোনেনি, এমন মানুষ কেউ নেই। রূপনারায়ণের ওপরের রেলব্রিজ দিয়ে ঝমঝমিয়ে গাড়ি গেলেই নিচে তাকাও। হুই হুই জল ছুটে চলেছে। সঙ্গে নৌকো, ডিঙ্গি, পানসি। যেমন নদীটির নাম, তেমনি দেখতে। নদী, না নদ? নাম শুনলেই যে রূপ চোখের সামনে, তা এক গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণের। খোলা খাঙা গায়ে শাদা উপবীত। সকালের রূপনারাণের আলেখ্য এই।—আমার মনে হয়। আমি রূপনারায়ণের উপর দিয়ে জীবনে সহস্রবার যাতায়াত করেছি। যতোবার দেখেছি, ওই একই দৃশ্য। দীর্ঘদেহ উন্মুক্ত তরবারির মতন ব্রাহ্মণমূর্তি তার।

রূপনারায়ণের এপারে হাওড়া। ওপারে মেদিনীপুর। এপারে নৌপালা বাংলো, ওপারে দেনাং ডাকবাংলো। পুরনো নাম কালসাপা। এপারটি দোতলা। ওপারেরটি একতলা। সুগঠিত দেয়ালঘেরা বিশাল এলাকার একপাশে এই বাংলো। সেচদপ্তরের। এখানে থাকার অধিকার দেবেন তমলুকের সেচ দপ্তরের আধিকারিক ইনজিনিয়ার।

কোলাঘাট স্টেশনটি এমনিতেই বেশ নির্জন-নির্জন। দুপাশে প্লাটফরম উধাও। সব চেয়ে মজা যেটা, তা হলো স্টেশনটি বেশ উঁচুতে। অনেক নিচে কোলাঘাটের রাস্তাঘাট, রেলওয়ে কাটিংস, দোকানপাট, বাজার গাঁ। লোকজন রিকসা সবই যেন একতলায়। স্টেশন দোতলার টং-এ।

স্টেশনে নেমে এই দেনাং বাংলো পৌঁছুতে রিকশা নিন। বাংলো এলাকার এক পাশে দুয়ার আছে। সিংদরজার বদলে এর সামনে পৌঁছুতে সময় অনেক কম লাগবে। এই মিনিট দশেকের মধ্যে। সিংদরজা ঘুর-পথে। দোকানপাট বাজার হাটের মধ্যে বেশ খানিকটা খোলামেলা সুন্দর জায়গা।

চৌকিদারের নাম ঠাণ্ডারাম। বহুৎ পুরনো লোক। রান্নার হাতটি চমৎকার। দুটো স্যুইট। বিছানা মাদুর খাট পালংক সব আছে। বিশাল ড্রয়িং-ডাইনিং। ডাইনিং হলে ফ্রিজ। বাংলোর ডানহাতি কালোজলের মিঠে দীঘি। ফুলে ফুলে ছয়লাপ। এখানকার গোলাপবাগান দেখার মতো। মালি আছে। মালির যত্ন আছে। গোটা চৌহদ্দি ছড়িয়ে বকুল আর কৃষ্ণচূড়া। ইউক্যালিপটাস ঝাউয়ের সার। মরামের পথ এদিক ওদিক চতুর্দিকে। সুন্দর ছবির মতন এই বাংলো যে না দেখেছে, দুদিন না থেকেছে—তার জীবনে একটু শূন্যতা রয়ে গেলো বৈকি।

নদীর ধারে সিমেনটের বাঁধানো চত্বর। জোৎস্নারাতে সেখানকার সুবাতাস আর আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ আর রূপনারায়ণ—জীবনের এ এক দুঃসহ অভিজ্ঞতা। 'দুঃসহ' জেনে শুনেই বললাম। সৌন্দর্যের একধরনের নিঃশব্দ অত্যাচার আছে। তাতে রক্তপাত হয়।

কালীঝোরায় একরাত

কালিমপং বা কালিমপং ছাড়িয়ে গ্যাংটক যাবার পথে পড়বে এই সুন্দর কালীঝোরা ডাকবাংলো। শিলিগুড়ি থেকে বাস আছে, ট্যুরিষ্ট ট্যাক্সি, ল্যানড-রোভার যাতে করে ইচ্ছে, গিয়ে, কালীঝোরায় নেমে পড়ুন। রাস্তার পাশেই, ডানহাতে বাংলো। ছবির মতো, কিন্তু সত্যি।

শিলিগুড়ি থেকে কালীঝোরা পর্যন্ত দুপাশে শালের জঙ্গল। মাঝেমধ্যে সেই শালবনে মিলিটারি ক্যাম্প। এসে দাঁড়াবেন তিস্তা রেলব্রিজ। এতক্ষণ বুড়ি তিস্তা সমতল চষে বেড়াচ্ছিলো। এখান থেকে চড়াই। আঁকাবাঁকা পথে সেবক ব্রিজ। রাস্তা ঠিক এখান থেকে দুদিকে ছুটলো। একটা আসামের দিকে, আরেকটা গ্যাংটকে।

এই বাংলোয় যদি একটা দুটো দিন থাকতে চান, তাহলে অনুমতি চেয়ে লিখুন: এ্যাসিসট্যানট ইনজিনিয়ার, পি ডবলু ডি, কালীঝোরা সাবডিভিশন।

কিছুই বয়ে আনতে হবে না তিন তিনটে সাজানো গোছানো ঘর। বাসন কোসন। চৌকিদার। সমস্ত মজুত। কালীঝোরা বাজার বাংলো থেকে মাইলটাক।

কালীঝোরা একটা টিলার ওপর। নীলবসনা বুড়ি তিস্তা বাংলোর ঠিক নিচে দিয়ে বয়ে চলেছে। কেন যে লোকে তিস্তাকে বুড়ি বলে? আমার মনে হয়, বুড়ি মানে কন্যা। লোকে যেমন আদর করে নিজের মেয়েকে বুড়ি বলে ডাকে, গোটা উত্তরবাংলার মেয়ে তিস্তা ঠিক তেমনই বুড়ি। বয়েসে নয়, রূপে নয়—শুধুই কন্যা রূপে, মায়ের রূপে।

পূর্ণিমা রাতে কালীঝোরা সত্যিই অবিশ্বাস্য। আপনি বারান্দায়

বসুন। কিংবা সোজা নদীর পাশের বিশাল চরে নেমে পড়ুন। হাঁটুন, হাঁটতে থাকুন। বালির ওপর জুতো চলে না। খালিপায়ে বালির ঠাণ্ডা আপনার মস্তিক ধুয়ে দেবে। স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, তো এই কালীঝোরাতে।

সকালে সূর্য যখন ওঠে, সেও আরেক দৃশ্য। তখন নীলরঙের নদীর রঙ লাল। তার ঐশ্বর্যই আলাদা, মর্যাদা ভিন্নরকম। মানুষ এখানে নদী গাছ পালা পাথরে মিশে যেতে আসে। অনুমতি নিয়ে আসাই ভালো, আগে থেকে। নচেৎ যদি ফিরতে হয়!

পর্যটন দপ্তরের উচিত কাশ্মীরের পহেলগামের মতো এখানে কিছু মধ্যবিত্ত কটেজ তৈরি করা। নেহাত, তা না হলে, লীডার নদীর ধারে থাকার জন্যে ক্যাম্প ভাড়া যেমন মেলে, তেমন কোনো ব্যবস্থা। সেটা আর কী এমন কঠিন? সাধারণ ব্যবসায়ী করে দেখতে পারে। ক্ষতি হবে না, বরং পরীক্ষামূলকভাবে তাই হোক। পর্যটন দফতরের ঘুম ভাঙে না, ভাঙতে চায় না।

রাজরাপ্পায় ছিন্নমস্তার মন্দির

পায়ে যাঁদের চাকা বাঁধা, দুদিন স্থির হয়ে থাকতে না থাকতেই যাঁদের ছুট্ লাগাতে হয় এমন মানুষের সংখ্যা কম নয়।

তাই বলছি, ছুটিছাটায় যাঁরা রাঁচী রামগড় বা হাজারীবাগের দিকে গেছেন, তাঁরা যদি একদিনের জন্যেও না গিয়ে থাকেন, ঘুরে আসুন রাজরাপ্পা। ঠিক ট্যুরিষ্টের মতন ঘুরে বেড়িয়ে দেখার মতন জায়গা এটা নয়। নিজের মুখোমুখি বসার জায়গা। অচঞ্চল, স্থির পাথরের মতন বসে থাকা, শুধু বসে থাকার জন্যে একবার অন্তত রাজরাপ্পা ঘুরে আসুন।

বাস থেকে নামলেই সামনে পূর্ত বিভাগের ডাকবাংলো। কাছাকাছি, মাইল তিন চারেকের ভিতর পাকা কাঁচা বাড়ি বলতে

ঐটিই একমাত্র। নেমেই দূরে তাকান, লালরঙ, বিশাল মন্দির। ছিন্নমস্তা কালী মায়ের মন্দির। জাগ্রত দেবী। দূরদূরান্ত থেকে নানান জাতধর্মের মানুষ পূজো দিতে আসে সম্বছর। সকাল নটা থেকে ভিড় শুরু। একটা মেলা-মেলা ভাব বেলা চারটে পর্যন্ত। তারপর বেদম ফাঁকা।

মন্দিরের একপাশে ভৈরো নদী? অন্য পাশে দামোদর। আধ মাইলটাক গেলে পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে দামোদরের উৎস। ভৈরো যেখানে দামোদরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, সেখানে একটা ছোট-খাট জলপ্রপাত। ভৈরো দামোদরের মিলিত স্রোত বাংলোর ঠিক নিচ দিয়ে বয়ে গেছে। বর্ষায় এর ভয়ংকর মূর্তি কল্পনা করা যায়। শীতে শান্ত।

রাজরাপ্পায় পৌঁছুতে হাওড়া থেকে রামগড় চলে আসুন। বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে ছোটখাট হোটেল ধর্মশালা পাবেন। একটা রাত মাথা গুঁজে দিন। সকালের বাসের খোঁজ নিয়ে রাখুন। একটাই বাস হাজারীবাগ থেকে। রাঁচী হয়ে এলে রামগড় বা গোলা থেকে ঐ বাসটাই ধরতে হবে। রাজরাপ্পায় ঐ বাস সাড়ে নটা নাগাদ পৌঁছুবে। একটা দেড়টায় ঐ বাস ফিরবে; বুড়ি ছুঁয়ে না থেকে ফিরতে গেলে ঐ বাস ছাড়া কোনো উপায় নেই। যাঁরা দু এক দিনের জন্যে থাকতে যাচ্ছেন, তাঁদের রামগড় থেকেই বাজারহাট সারতে হবে। বাসনপত্তর বাংলোতে। সিগারেট যতো পারেন নিয়ে নিন। ওখানে কিছু মিলবে না। বাংলোয় চৌকিদার আছে। ঘর দুটো। একটা খুব সাজানো সরকারি সায়েবসুবো ভি আই পিদের জন্যে। অন্যটায় বুঝি তাঁদের খিদমদগারদের থাকা। রিজারভেশন করে গেলেই ভালো। নতুবা চৌকিদারের মর্জির উপর নির্ভর করতে হবে। সেটা রিস্কি। বাংলো চারজ প্রতিদিন আড়াই টাকা। এছাড়া যা খরচ, সে তো আপনি করেই ফেলেছেন। চৌকিদারকে যা খুশি বকশিস করুন, হাত পেতে নেবে।

ঝটিকা-সফরের সঙ্গী

দিললির চিঠি আগেই পেয়েছিলাম। কলকাতা কেন্দ্রের প্রধান ফোনে যোগাযোগ করলেন। ঠিক করলাম, যাবো। জায়গাগুলোর প্রায় সবখানেই এক আধবার গিয়েছি। লোভ ছিলো, অন্যান্য রাজ্য থেকে যে সব তরুণ লেখক কবি যাচ্ছেন, তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে। লিস্টি দেখে মালুম হলো, বাঙালী লেখক ছাড়া বাকি এক আধজনের সঙ্গে পরিচয় আছে। সুনীল শীর্ষেন্দুর যাবার কথা ছিলো। ওরা হঠাৎই জানালো, যেতে পারবে না। সুনীল তার কিছুদিন আগেই মাসখানেকের জন্যে আন্দামান ঘুরে এসেছে। তৎক্ষণাৎ আবার ছুটি পাওয়া মুশকিল। শীর্ষেন্দুর পারিবারিক অসুবিধা হওয়াতে এবারের মত রুখে যেতে হলো। ঠিক আছে, সুশীলদাকে (ডঃ সুশীল রায়) ধরলাম। প্রথমে ফোনে, তারপর সশরীর। কলকাতা কেন্দ্রে জানালাম, ওঁর সঙ্গে এক্ষুনি যোগাযোগ করার জন্যে। আশিস যাচ্ছে। আর যাচ্ছেন কৌটিল্য গুপ্ত। ওঁকে আমরা আমাদের দু সপ্তাহের সফরে 'বরযাত্রী'র কে. গুপ্ত হিসেবে গড়ে নিয়েছিলাম।

ভ্রমণসূচী মোটামুটি এরকম। আমরা প্রথমে যাবো পাটনা। সেখান থেকে নালন্দা পাওয়াপুরী রাজগীর বোধগয়া সেরে যাবো আধুনিক শিল্পাঞ্চলগুলি দেখতে। তার মধ্যে সিন্ধ্রি সার কারখানা, বোকারো, টাটা, রাঁচী, হাতিয়া পড়বে। অধিকন্তু, হাজারীবাগের তিলাইয়া ড্যাম।

থাকতে হবে অর্থাৎ রাত কাটাতে হবে—পাটনা, রাজগীর, বোধগয়া, সিন্ধ্রি, টাটা, বোকারো, তিলাইয়া, রাঁচী এবং পুনর্বার পাটনায়।

আমরা হাওড়া থেকে যে যার খরচায় ট্রেনে উঠলাম। সরকার ভ্রমণশেষে পাইপয়সা মিটিয়ে দেবেন। পাটনা পর্যন্ত পৌঁছুলে বাকি দায়িত্ব ওঁদের।

সুশীলদা আশিস প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেটেছে। আমি যাঁকে কাটতে দিয়েছিলাম, তিনি সস্তায় দ্বিতীয় কেটে দিয়েছেন। সুশীলদার ক্যুপে জায়গা থাকায়, সঙ্গে সঙ্গে আমি টিকিট বদলে ওঁর ঘরে।

তারপর সারারাত হৈচৈ করে, না ঘুমিয়ে, কারুকে ঘুমোতে না দিয়ে পাটনায় পেঁছুনো। সেখানে গান্ধীময়দানের সামনে বেশ বড় হোটেল। নামটা মনে করতে পারছি না। সে রাত পাটনায়। পরদিন ভোরে টি সি ডিসি-র ডিলুক্স বাস। পাইলট শ্রীবাস্তব। যাত্রা শুরু।

একটু পিছিয়ে যাই। একটু সরকারি কর্মদক্ষতার পরিচয় দিই। স্টেশনে আমাদের নিতে কেউ আসেনি। সে দিন কী একটা কারণে ছুটি ছিলো। সুতরাং কর্তৃপক্ষদের দোষ দেওয়া যায় না। আমরাও পাটনায় নতুন নই। সুশীলদার দাদা ভাইঝি থাকেন। আমার তো বসুধৈব। কম করেও সাক্ষাৎ আধডজন ডেরা আছে, যেখানে অনায়াসেই উঠে পড়া যাবে। তা ছাড়াও খুঁজলে বহুৎ। সুতরাং, ভয় পাই নি। শুধু মেজাজটা একটু খিঁচড়ে গিয়েছিল।

বিহার সরকারি তথ্যকেন্দ্র থেকে একটি গাড়ি স্টেশনের গায়ে লাগানো ছিলো। সরকারি গাড়ি দেখে এগিয়ে জিজ্ঞেস করতেই বললো, হ্যাঁ, আমি আপনাদের নিয়ে যেতেই এসেছি।

কিন্তু, কোন হোটেলে আমাদের ব্যবস্থা হয়েছে তার বিন্দুবিসর্গও সে জানতো না। তথ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া ছাড়া, তার করনীয়ই বা কী? সেখানে তালাবন্ধ। ইনফরমেশন অফিসার ভারমাকে ফোন করা হলো। তাঁর পেটের অসুখ। তিনি আসতে পারবেন না। হোটেলের নাম বললেন। ব্যবস্থা পাকা, তাও বললেন। আমরা ভেসে চললাম।

প্রথম দরকার, হাতমুখ ধোওয়া—চা খাওয়া এবং একটু বিশ্রাম।

রাত ভালোই কেটেছিলো। দিনের শুরু বিহারে। বিহারি দক্ষতার সঙ্গে আমার পূর্বপরিচয় অনেক দিনের।

কপাল ঠুকে হোটেলের দিকে। আমাদের আগে অন্যান্য রাজ্য থেকে প্রায় সবাই এসে গেছেন। দু তিনজন আসতে বাকি। আর আমরা তো এসেই গিয়েছি। ঘরের বিলিব্যবস্থা দু চারটি হয়েছে। আমরা সর্বসাকুল্যে জনা আঠারো। সুতরাং কী হবে না হবে ভাবতে ভাবতে পেটরোগা ভারমা সায়েব এসে পৌঁছুলেন। তাঁর সহকর্মী এতক্ষণ হিমসিম খাচ্ছিলেন। ভারমা এসে মোটামুটি নৌকার হাল ধরেছেন।

আমি আর সুশীলদা শেষ পর্যন্ত এমন একটি ঘর পেলাম, যা ঘরও বটে, গুদামও বটে। এটা ওটা সরিয়ে ধুলো ঝুলের মধ্যে দুটো তক্তা পেতে দেওয়া হলো। আমরা অন্যঘরে হাতমুখ ধুয়ে নিলাম। প্রথমে কোনোরূপ চিন্তার মধ্যেই গেলাম না। মাথা গরম হয়ে আছে। বর্ষার সঙ্গে দেখা। বর্ষা আমাদের বন্ধু চিত্রকর যতীন দাসের স্ত্রী। বারিপদায় আলাপ হয়েছিলো। কলকাতায় আবার দেখা। দিললিতে থাকে। বর্ষা নিজে লেখে, অনুবাদ করে, আঁকে, গান গায়, নাচে। আপাতত কাজ ন্যাশনাল বুক

ট্রাস্টে। সেই কৃষ্ণকলি বর্ষা আলাপ করিয়ে দিলো বিজয় দাসের সঙ্গে। ওড়িশার লেখক। এন বি টি-র চাকরে। একসঙ্গে দিল্লি থেকে এসেছে। অল্পবয়সী। সুন্দর ছেলে বিজয়। ভাঙা ভাঙা বাংলা জানে। বর্ষার বাংলা চমৎকার। ও চারভাষিণী। মাতৃভাষা গুজরাতি। বাংলা, ওড়িয়া, ইংরিজি খুব ভালোভাবে জানে।

আলাপ হলো একগাল দাড়ি শান্ত নম্র শীতাংশুর সঙ্গে। ও বমবে থাকে। অধ্যাপনা করে। ওর সঙ্গে গুজরাতি গল্প লেখক পারেখও এসেছে। শীতাংশু কবি। দেখতে অনেকটা আমাদের বন্ধু কবি অ্যালেন গিনসবারগের মত।

সৌভাগ্য মিশ্র এসেছে কটক থেকে। আমাদের পুরনো বন্ধু। ওকে পেয়ে আশ্বস্ত হলাম নানা কারণে। নতুবা পিছন ফিরে হাঁটা দেবার বাসনা ভেতরে দানা বাঁধছিলো। বিজয় আবার সৌভাগ্যের ছাত্র। সুতরাং বিজয়ের পরিচর্যা আমরা দুজনেই পথে পাবো— এবিষয়ে স্থির নিশ্চিত হলাম তৎক্ষণাৎ।

দুজন উর্দু লেখক এসেছে দেরাদুন আর দিল্লি থেকে। গোঁফ গজায় নি। ওদের লেখা সম্পর্কে আমার কিছু জানা ছিলো না। দুজন হিন্দি কবি ছিলেন সঙ্গে। কবি না বলে গান-বাঁধিয়ে বলাই ভালো। দুজনের পুরনো গণনাট্যসংঘের সঙ্গে বিশেষ যোগ ছিলো।

এসেছিলেন পুনে থেকে সংস্কৃত কবি গ্যাডগিল। ইতিহাস বই-এর নায়কের মতো চেহারা। মানুষটি ভালো। স্বত্বগুণ বেশি থাকায়, আমরা ওঁর নাম দিয়েছিলাম, পণ্ডিতজী। ঐ নামে ডাকলে উনি খুশি হতেন। সংস্কৃতে বাক্যালাপ করতে এলেই আমরা এদিক ওদিক সরে পড়তাম। এছাড়াও, আরো হয়তো দু একজন ছিলেন। এখন আর মনে নেই। বেশ কিছুকাল আগের ব্যাপার। এবং বড়ো কথা, যে কারণে গিয়েছিলাম, আমাদের কারো সেই বাসনা

পূর্ণ হয় নি। অনেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ই হয়নি। শুধু ঝড়ের মতো এখান থেকে ওখানে ছুটে বেড়িয়েছি।

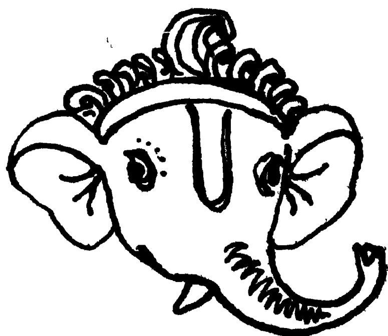
সরকারি ব্যবস্থা আমাদের পিছনে পাঁচনবাড়ি নিয়ে আমাদের একপাল গরু ছাগলের মতো এমাঠ থেকে দূরমাঠে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। আমরা কেউই এটা আশা করিনি।

দেশ দেখতে এভাবে কখনো বেরুই নি। এভাবে দেশ দেখা যায় না। আমরা ট্যুরিস্ট ছিলাম না। কেউ কেউ একটু আধটু লিখে ফেলেছি। আমার পাশের লোকটি কি লেখে কেন লেখে— এসবের হদিস পাবারই সময় পাই নি। এরকম ঝটিকা-সফরে কার কী লাভ হলো জানি না। অর্থনাশ ছাড়া এর কারণ আমি আজও খুঁজে পাই নি।





ঘুরে-ফিরে আবার পাটনায়





এবার নিয়ে পাটনায় গেলাম বার দশেক। তবে কোনদিনই হোটেলে উঠতে পারা যায় নি। চেনাশুনা বন্ধুবান্ধবদের চোখ এড়িয়ে হোটেলে ঢোকা অসম্ভব ব্যাপার। এবার ভারত সরকারি ব্যবস্থায় হোটেল প্যালেস। হ্যাঁ, নামটা মনে পড়েছে।

পাটনায় সবচেয়ে সুন্দর গঙ্গা। আমি যতবার গেছি গঙ্গার ধারে সন্ধে নাগাদ পৌঁছে যেতাম। গাদা গাদা ছোটবড় হোটেল —গ্রানড, নটরাজ, রিপাবলিক, প্রিন্স, অমর, রাজস্থান, শ্রীপ্রকাশ, মাড়োয়ারি হোটেল। এছাড়া বিশালকায় সারকিট হাউস আর পর্যটন অফিসের কাছের ডাকবাংলো। ৫ টাকা মাথাপিছু দিনে। খাবার আলাদা। রিজারভেশন করতে অধিকারী হলেন জেলা ইনজিনিয়র, পাটনা। রেলের রিটায়ারিং রুম, ইউথ হসটেল ধর্মশালা, গুরুদোয়ারা।

দেখার জিনিস বলতে গোলঘর, হরমন্দির, কুমরাহার (প্রাচীন পাটলিপুত্র) নবাব সায়েবের মাকবরা, আফিমের কারখানা, মিউজিয়াম, খোদাবক্স লাইব্রেরী। বোধগয়া পাটনা থেকে ১৭৮ কিলোমিটার, গয়া মাইল সাতেক কম। নালন্দা ৯০ কিমি।

পাওয়াপুরী সবচেয়ে কাছে। পাটনা থেকে মাইল সাত। বিখ্যাত জৈনতীর্থ। ১০৩ কিমি গেলে পড়বে রাজগীর বা রাজগৃহ।

পাওয়াপুরীতে ঝাঁকিদর্শণ সেরে আমরা ছুটলাম নালন্দায়। আগেও গেছি। এবারে আমাদের সঙ্গে বাহন আছে। নয়তো বখতিয়ারপুর হয়ে যেতে হয়। বাস আছে। নালন্দা রোড়ে নেমে নালন্দা এক মাইলের মতো।

থাকার হোটেল নেই। বাংলো আছে, রেস্ট হাউস, ইউথ হসটেল, ধর্মশালা আছে। দু-একদিন থেকে ঘুরেফিরে না দেখলে মন ভরে না। এবার আমরা ঠিক ট্যুরিস্টের মতন নালন্দা দেখতে এসেছি। দেখেই ছুটবো রাজগীর। সেখানে রাতের বিশ্রাম।

পাটনা, পাওয়াপুরী, নালন্দা, রাজগীর, বোধগয়া, টাটা,
রঁাচী, তিলাইয়া, বোকারো সিন্ধ্রি হয়ে আবার পাটনা।

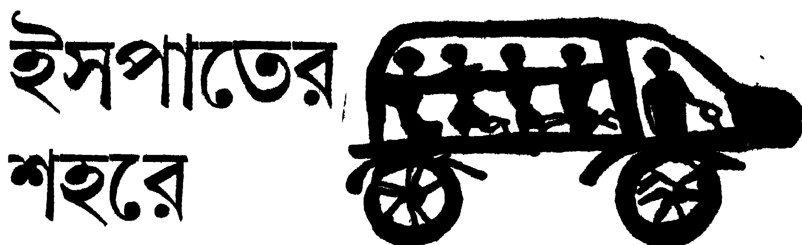
চমৎকার ট্যুরিস্ট বাংলো। ভাড়া শস্তা। মাথাপিছু পাঁচ। ডরমিটরি আছে। এছাড়া জেলা বোরডের বাংলো, রেষ্ট হাউস বনবাংলো, সারকিট হাউস, ধর্মশালা। দেখার জিনিস প্রচুর। সবই ধ্বংসস্তূপ। অজাতশত্রুর দুর্গ, স্তূপ, বিম্বিসারের জেলখানা, গৃধ্রকূট, হটস্প্রিং, মনিয়ার মঠ, স্বর্ণভাণ্ডার, বিশ্ব শান্তিস্তূপ। এই মন্দিরে যেতে গেলে দড়িপথের সাহায্য নিতে হয়। আমি কখনো দড়িপথে উঠিনি। আবার আমার আছে ভারটিগো। সুতরাং না যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলাম। সঙ্গীসাথীরা ছাড়লো না। যেতেই হলো। ভয় লাগলেও অভিজ্ঞতা ছিলো নতুন।

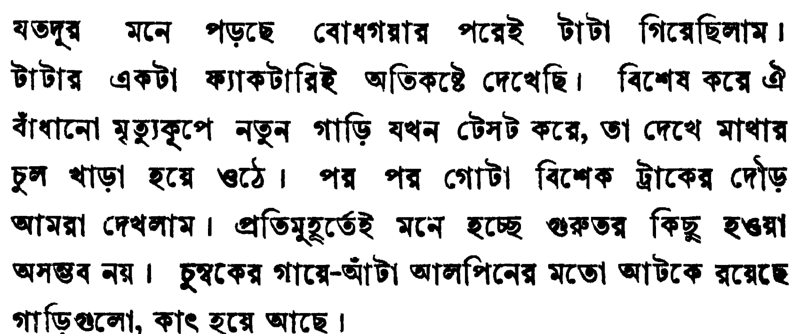
রাতটা রাজগীরে থাকা। খুব হৈ হৈ হলো। দুজন হিন্দি কবি সম্মেলন আর সভার কথা বলতে আমি আর সৌভাগ্য আমাদের পাইলট শ্রীবাস্তবজীকে নিয়ে চুপি চুপি কেটে পড়লাম। ও সব ঘোঁতঘাঁত জানে। সুতরাং অসুবিধে হবে না। ও বাসটাকে ছুটিয়ে নিয়ে চললো। বড় দৌড়ের আগে একবার গ্যারেজে দেখিয়ে

নেওয়া দরকার। তাছাড়া তেলও নিয়ে নিতে হবে। আমাদের মধ্যে আর একটি ছোট দল গেলো গরম জলের কুণ্ড দেখতে। অল্প অল্প ঠাণ্ডা আছে। গায়ে গরম জামা দরকার। সৌভাগ্য যুবক। ও বুক ফুলিয়ে হাঁটে। ও কিছু নিলই না। কখন ফেরা হবে তার তো কোনো ঠিকঠিকানা নেই। আমি একটা হাতকাটা সোয়েটার নিয়ে নিলাম। সবচেয়ে বড়ো কথা, আমরা যা টাকা এনেছিলাম তা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। সরকারি পয়সা, শোনা গেলো, পাটনা ফিরে যাওয়া যাবে। তাহলে সফরটাই মাটি। শ্রীবাস্তবের মন দেখলাম হাটখোলা। সে বললো, কুছ পরোয়া নেই। আমি তো আছি। সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার আমার দরকার পড়লে আপনাদের কাছ থেকে চেয়ে নেবো। চলুন। বাংলাটাও খুব সুন্দর শ্রীবাস্তবের। মিথিলার মানুষ তো ?

রাজগীর থেকে বোধগয়া। যে বোধিগাছের তলায় বসে বুদ্ধদেব বোধিপ্রাপ্ত হন—সেই গাছ, হয়তো ঠিক সেই গাছ নয়, তার কোনো সন্ততি থেকে কয়েকটি ঝরাপাতা কুড়িয়ে নিলাম। বাচ্ছাদের দেবো। ওরা বইয়ের মধ্যে পাতার ভাঁজে রেখে দেবে। গেলাম নীরাঞ্জনা নদী দেখতে। জলশূন্য, মরুভূমির শুকনো বালি আর হুই হুই করছে হাওয়া। ইতস্তত ময়ূর দেখলাম নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জাপানি, চীনা, তিব্বতি, বর্মী কতরকমের যে মোনাস্টেরি দেখলাম তার ঠিক নেই। এখানেও এ রাতটা কাটাতে হবে। সুন্দর ট্যুরিস্ট লজ। মাথাপিছু টাকা পঁচিশ। তিন থেকে বারো বছরের বাচ্চার জন্যে অদ্ধেক। মহাবোধি রেস্ট হাউস আছে, পি ডবলু ইনসপেকশন বাংলো আছে, ধর্মশালা আছে। ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেনটারে যে কোনো খবর আর সাহায্যের জন্যে যাওয়া যেতে পারে। মোনাস্টেরিগুলোতেও থাকা যেতে পারে তাদের অতিথিশালা আছে। প্রধান ভিক্ষুকে লিখে অনুমতি আনানো যেতে পারে।

ইসপাতের শহরে





যতদূর মনে পড়ছে বোধগয়ার পরেই টাটা গিয়েছিলাম। টাটার একটা ফ্যাকটারিই অতিকষ্টে দেখেছি। বিশেষ করে ঐ বাঁধানো মৃত্যুকূপে নতুন গাড়ি যখন টেসট করে, তা দেখে মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে। পর পর গোটা বিশেক ট্রাকের দৌড় আমরা দেখলাম। প্রতিমুহূর্তেই মনে হচ্ছে গুরুতর কিছু হওয়া অসম্ভব নয়। চুম্বকের গায়ে-আঁটা আলপিনের মতো আটকে রয়েছে গাড়িগুলো, কাৎ হয়ে আছে।

জামশেদপুর সম্পর্কে কীই বা বলার আছে? ইনডাস্ট্রিয়াল শহর যেমনটা হয়, এটাও তেমন। নদীর নাম সুবর্ণরেখা। ডিমনার লেক। খড়কাই সুবর্ণরেখা মিলেছে। দূরে দলমা পাহাড়। তার চূড়ায় উঠে জামসেদপুরের পুরো ছবিটাই চোখের উপর ভাসে। বিদেশীরা থাকতে পারেন এমন ভালো হোটেল অন্তত পক্ষে তিনটে আছে। বুলেভারড, নটরাজ—দুটোই বিষ্টুপুরে। আরেকটা টিসকো হোটেল। ভারতীয় স্টাইলে হোটেল বিস্তর : গ্রীন হোটেল, মর্ডান, হিন্দু, গুজরাট বোরডিং এইসব। ডিমনার লেক হাউসে যদি জায়গা পাওয়া যায়, তাহলে এর মতো ভালো আর হয় না। ডিরেকটর, টাউন সার্ভিস, টিসকো—মীর্জাডিহি, টেলিঃ ৩৬৩১, লিখে বা ফোন করে দেখা যেতে পারে। মাথাপিছু ১২ টাকা

ভাড়া। খাওয়া আলাদা। এছাড়া আছে অসংখ্য ডাকবাংলো, স্টিলের অতিথিশালা, ধর্মশালা কতো কী।

টাটা ছেড়ে সিন্দ্রি। তৈরি করা সারের শহর। ওখানেও গেছি অসংখ্যবার। এবারের যাওয়াটা একটু অন্যরকম। গাড়ী ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখালো। আগেও দেখেছি। কর্মকর্তারা আমাদের একটা হলঘরে চা খাবার খাওয়ালেন। দুচারকথা শোনালেন এই কারখানা সম্বন্ধে। আমাদের স্বাগত জানালেন। ওদের গেস্টহাউসে সেইরাতটা কাটিয়ে পরদিন রাঁচী না বোকারো? ঠিক মনে পড়ছে না। তবে এভাবে ঘুরে সর্বাংশে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি ইতিমধ্যে। বিশেষ করে কলকারখানা দেখে দেখে হাঁফ ধরে গেছে। যেটুকু সবচেয়ে ভালো তা হলো বাসে চেপে দৌড়ে যাওয়া পথ। দুপাশে মহুয়া গাছ। হাওয়ায় ঝরছে মহুয়ার পাকা ফুলের রাশি। সবাই ঝুড়ি ভরছে। গন্ধে মাতাল হয়ে উঠছে মানুষ, পশুপাখি। আমরাও বাস থামিয়ে মুঠো মুঠো মহুয়া ফুল জোগাড় করছি। কাটিয়ে পরাগ খসিয়ে খাচ্ছি মুঠো মুঠো। কে যেন বললো, বেশি খাওয়া ঠিক নয়। পেট ছেড়ে দেবে। অভ্যেস নেই তো?

বোকারোতেও স্টীলের গেষ্ট হাউস খুব ভালো। এয়ারকনডি-শনড ঘর। খাবার চমৎকার। কিন্তু, আর কী? রাঁচীও তাই। কাঁকের দিকটা ছাড়া আর কিছু দেখার মতো নয়। হুনড্রু জোনার কথা ছেড়ে দিলাম। একটা ব্যাপার ঠিক করে নিয়েছিলাম, না, আর নয়—কিছুতেই কারখানা দেখতে যাচ্ছি না। অপ্সরা হোটেলে পৌঁছেই ভেতর থেকে ঘর বন্ধ করে চিৎ হলাম বিছানায়। মোরাবাদী হিল বা টেগোর হিল আড়াই মাইলটাক হবে। রাঁচীর গুরুত্ব হলো, ওকে বুড়ি ছুঁয়ে ছোটো, দৌড়াও—যে দিকে পারো।

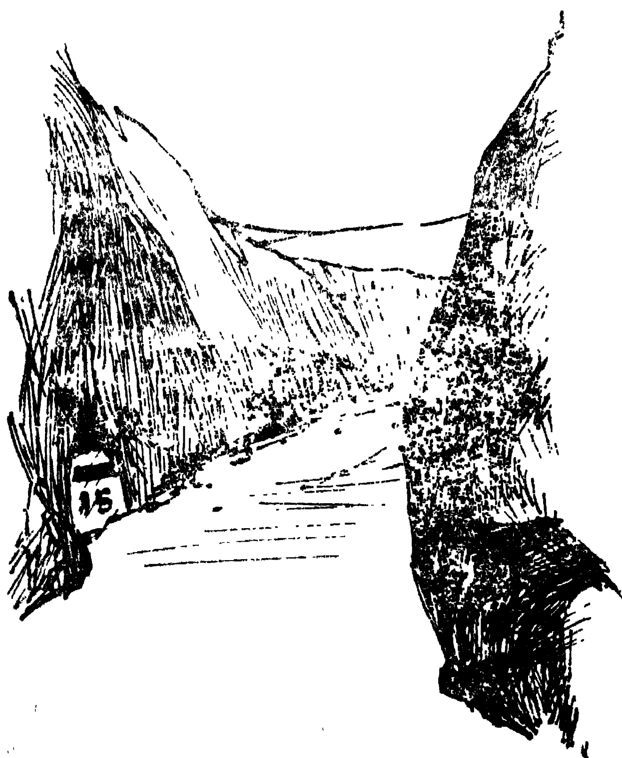
রাঁচী থেকে পালামৌ

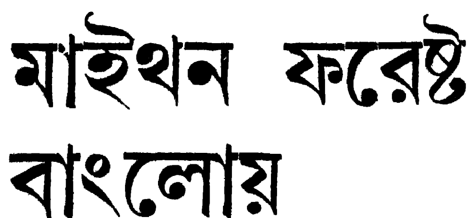


বেতলা ন্যাশনাল পারক পালামৌ জেলায় রাঁচী-ডালটনগঞ্জ সড়কে, পড়ে, রাঁচী থেকে ১০৮ মাইল। নিয়মিত বাস যাচ্ছে রাঁচী থেকে। বিহার সরকারের বনদপ্তরের একটা বাংলো আছে। বাঘ, ভালুক, হাতী ছাড়া চিতা হায়না অসংখ্য। সম্বর হরিণ প্রচুর। হাজারিবাগের ন্যাশনাল পারকও রাঁচী থেকে যেতে হয়। দূরত্ব ৫৯ মাইল। হুরহাপ জঙ্গলও রাঁচী থেকে মাইল দশ। সুন্দর পিকনিকের জায়গা, বনবিভাগের বিশ্রামাগার আছে। নেতারহাটও ১০০ মাইলের মধ্যে। দশমঘাঘ প্রপাতও ২৪ মাইল। কাঞ্চী নদী ১৪৪ ফুট উঁচু থেকে পড়ছে। বহু ছোটখাটো প্রপাত তার মধ্যে বারলা আর পারওয়াঘাঘ প্রধান। ফলসের পাশে বনবিভাগ একটা রেস্টহাউস বানিয়েছে। ছোট বড় হোটেল বিস্তর। ডাকবাংলো অটোমোবিল এ্যাসোসিয়েশনের গেষ্ট হাউস, সারকিট হাউস, ধর্মশালা প্রচুর। সবকটা ধর্মশালাই আপার বাজার অঞ্চলে।

সবচেয়ে ভালো লেগেছে তিলাইয়ার ড্যাম। কোডারমা থেকে ১২ মাইল—হাওড়া দিললি গ্রানড করড লাইনে কোডারমা স্টেশন হাওড়া থেকে ২৩৯ মাইল। তিলাইয়া কোডারমা বাস আছে সবসময়। পাটনা রাঁচীর সঙ্গেও বাস যোগাযোগ আছে।

ডি ভি সি ইনসপেকশন বাংলো একটা টিলার ওপর। দিনে মাথা-পিছু ৫ টাকা থাকা খরচ। বিছানাপত্র সব মজুত। খাবার বানিয়ে দেবে চৌকিদার। আরেক আছে জনতা নিবাস। মাথাপিছু ছু টাকা। বিছানা মাতুর নেই। রিজারভেশনের অধিকারী, চীফ ইনফরমেশন অফিসার, ডি ভি সি, ভবানীভবন, আলিপুর কলকাতা-২৭। কিংবা, এ্যাসিসটানট ইনজিনিয়ার, ইলেকট্রিক টাউন (ডি ভি সি) পোঃ অঃ তিলাইয়া ড্যাম। খাবারের বাঁধা দাম। দামোদরের জলের রঙ ঘন নীল। তিলাইয়া থেকে নিয়মিত মাছের চালান যায় রাঁচী হাজারীবাগ বোকারোয়। আমরা তুদিন ওখানে ছিলাম। তিলাইয়া থেকে আবার পাটনা। যাত্রা শেষ।







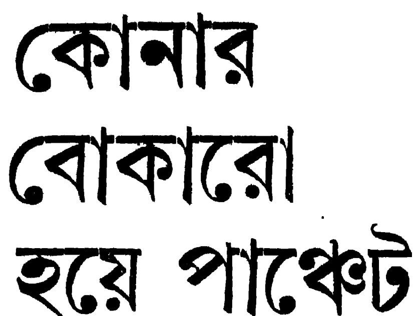
মাইথনে গিয়ে উঠেছিলাম বনবিভাগের বাংলোয়। ওপরের বিশাল ঘরে। বাংলোটা দোতলা। সামনে দামোদরের রক্তচক্ষু জল। পিছনে পাহাড় জঙ্গল। কলকাতার আলিপুরের ফরেস্ট অফিস থেকে অনুমতি নিয়ে গিয়েছিলাম। ছিলাম তিনদিন। নিচে বিশাল ডাইনিং হল। ফ্রিজ। সুন্দর ক্রোকারিজ। নিচে আবার পর পর তিনটি স্যুইট। মাইথনের মতো এতো বড়ো জলাধার আর নেই। মায়ের থান থেকে নাম হয়েছে মাইথন। কল্যাণেশ্বরীর মন্দির। বরাকর রেলস্টেশনে নেমে মাইথন আসা সহজ। ছ মাইল পথ। বাস আছে। ট্যাক্সিও পাওয়া যায়। আসানসোল থেকে ১৬ মাইল। আমরা আসানসোল থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে গিয়ে ছিলাম। পথে থামিয়ে মুরগি কিনে, তেল মসলা সওদা করে। চাল ডাল তুলে। টাকা তিরিশেক ভাড়ায় এখন আর যাওয়া যাবে না। পঞ্চাশে বিলকুল হয়ে যাবে। দামোদরের জলে মোটরবোটে পাক খাওয়া যায়।

এখান থেকে দুর্গাপুর ৪১ মাইল, তোপচাঁচী ৪২ মাইল। কলকাতা থেকে বর্ধমান আসানসোল হয়ে ১৫৫ মাইল পথ।

জায়গাটা বনের মধ্যে বলে নির্জন। তবে কাঁটাতারের বেড়া চতুর্দিকে। লোহার গেটে অনুমতিপত্র দেখালে তবেই ভেতরে ঢোকা যাবে। নিচের বারান্দায় রেলিং-এ রকমারি গাছ সারবন্দী টবে সাজানো। সামনের মাঠ ভর্তি যাবতীয় ফুলগাছ। অতসীর জঙ্গলে থিক থিক করছে প্রজাপতি।

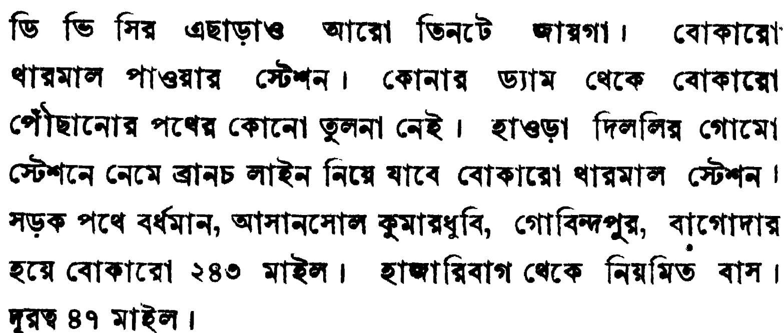
একপাশে বিরাট ছাদ, সামনে বারান্দা, বাঁদিকে চওড়া ঢাকা বারান্দা। অষ্টপ্রহর জল। আমরা বেড়াতে বেড়াতে চলে যেতাম সুন্দর পীচ রাস্তা ধরে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাইডাল স্টেশন। ঝুলন্ত ব্রিজের উপর দিয়ে একটা দ্বীপের মতন জায়গায়। সেখানে বিস্তর থাকার জায়গা করেছে ডি ভি সি। দোতলা ইনসপেকশন বাংলো জনতা নিবাস, শান্তিনিবাস, বিশ্রাম কুটির, যাত্রী নিবাস, ট্যুরিস্ট উইং। শস্তায় থাকা যায় খাবার ব্যবস্থাও পাকা। রিজারভেশন আলিপুরের ইনফরমেশন অফিসারের কাছ থেকে নিতে হবে। এছাড়াও একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার (ড্যাম ডিভিশন), মাইথন (ডি ভি সি) ধানবাদ—এই ঠিকানায় চিঠি দিলে পাওয়া যেতে পারে।

শনিবার বা অন্যান্য ছুটির দিন গাড়িতে গাড়িতে ছয়লাপ। বিকেলে ড্যামের ধারে ফেরিওলার ভিড়। চা পানির দোকানের সামনে সার সার বেনচি পড়ে। সন্ধে থেকে ৮।৯ টা রাত পর্যন্ত চমৎকার। তারপরই নির্জনতা নেমে আসে। জঙ্গলে ভালুক চিতা আছে। এখন অবশ্য লোকজনের ভিড়ে বনের পশু বেরুতে ভয় পায়। কলকাতার কাছে এত সুন্দর জায়গা খুবই কম।



কোনার বোকারো হয়ে পাঞ্চেট





ডি ভি সির এছাড়াও আরো তিনটে জায়গা। বোকারো থারমাল পাওয়ার স্টেশন। কোনার ড্যাম থেকে বোকারো পৌঁছানোর পথের কোনো তুলনা নেই। হাওড়া দিললির গোমো স্টেশনে নেমে ব্রানচ লাইন নিয়ে যাবে বোকারো থারমাল স্টেশন। সড়ক পথে বর্ধমান, আসানসোল কুমারধুবি, গোবিন্দপুর, বাগোদার হয়ে বোকারো ২৪৩ মাইল। হাজারিবাগ থেকে নিয়মিত বাস। দূরত্ব ৪৭ মাইল।

ডি ভি সির ইনসপেকসন বাংলো রয়েছে। মাথাপিছু দিন ৫ টাকা। খাবার আলাদা। তারও বাঁধা দর। এছাড়া আছে, জনতা নিবাস। মাথা পিছু দু টাকা। আলিপুরে তো রিজারভেশন করাই যায়, তাছাড়া, জেনারেল সুপারিনটেনডেনট—বোকারো থারমাল পাওয়ার স্টেশন (ডি ভি সি) পোঃ বোকারো, হাজারিবাগ—এখানে চিঠি লিখে অনুমতি পাওয়া যেতে পারে।

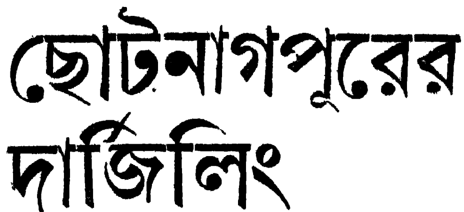
কোনারে যেতে গোমিয়া স্টেশনে নামতে হবে। গোমো থেকে ব্রানচ লাইন কোনারে গেছে। কলকাতা থেকে গোমিয়া ২১৮ মাইল

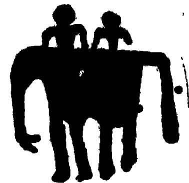
বেরমো বা হাজারিবাগ রেল স্টেশনে নেমেও কোনারে যাওয়া যেতে পারে, সেক্ষেত্রে যথাক্রমে দূরত্ব দাঁড়াবে ১৪ মাইল আর ২৪ মাইল। তিলাইয়া থেকে ৫৮ মাইল। নিয়মিত বাস আছে গোমিয়া আর বেরমো থেকে। হাজারিবাগ থেকে ট্যাক্সিও পাওয়া যায়।

থাকার কোনো জায়গা নেই। বোকারো থেকে অনেকে যায়।

মাইথন থেকে পাঞ্চেট মাত্র ১০ মাইল। পাঞ্চেট পাহাড়ের নিচে ড্যাম। ৪ মাইল লম্বা। হাইডেল পাওয়ার স্টেশন ৪০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। আসানসোল থেকে ১৯ মাইল। পাঞ্চেট আসানসোল আর মাইথনের মধ্যে নিয়মিত বাস। ট্যাক্সি আসানসোল থেকে পাওয়া যাবে।

ডি ভি সির ইনসপেকশন বাংলো ছাড়া অন্য কোনো থাকার জায়গা নেই। রেট এক। আলিপুর ছাড়া, একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার, পাঞ্চেট ডিভিশন, পোঃ পাঞ্চেট, ধানবাদ। এখানে লিখে অনুমতি আনানো যাবে। বিছানা মাদুর সবই ওখানে মিলবে। বাঁধা দরে খাবার।





রাঁচী থেকে নেতারহাট ৯৬ মাইল। ছোটনাগপুরের দার্জিলিং এর আরেক নাম। এপরিল মে ছাড়া, পুজোর সময় অর্থাৎ অকটোবর নভেম্বর সবসেরা বেড়াবার সময় এখানে। রাঁচী থেকে নিয়মিত বাস। তাছাড়া টুরিস্ট ট্যাক্সি আছে।

বিহার সরকারের ট্যুরিস্ট বাংলোই প্রধান। খাবার বিছানা মাদুর সব মেলে। ডরমিটরি ছাড়া, চব্বিশটা বেড আছে। দিনে মাথা পিছু খরচ ৫ টাকার ভিতরে।

বনবিভাগের রেস্টহাউস আছে। ডি এফ ও ডোরানডা-কে লিখে থাকার অনুমতি জোগাড় করতে হবে। সুন্দর যে বাংলোটায় আমরা দু দুবার গিয়ে উঠেছিলাম তার নাম পালামৌ ডাকবাংলো। ডবল-বেডেড ঘরের চারজ, যতদূর মনে পড়ছে, দিনে ১৪ না ১৫। জেলা ইনজিনিয়ার, জেলা পরিষদ, ডালটনগনজ-কে লিখে অনুমতি আনতে হবে। খাবার ব্যবস্থা চৌকিদার করে দেবে। মশারি বালিশ সব আছে। লাগোয়া বাথরুম।

এছাড়া আছে পূর্ত বিভাগের বাংলো, রেভিনিউ বাংলো, ইউথ হসটেল। ইউথ হসটেলে বিদ্যুৎ নেই। প্রিনসিপ্যাল, পাবলিক স্কুল, নেতারহাট-কে লিখে সেখানে জায়গা পেতে হবে। বুড়হাঘাঘ

কলস (৪৬৬ ফুট), হেলার ফরেসট, কোয়েল ভিউ পয়েণ্ট, ম্যাগনোলিয়া পয়েণ্ট—এসমস্তই দেখার জিনিস। আর সবাই যেজন্যে নেতারহাট আসে তা এর নির্জন সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্যে। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত প্রাণভরে চোখ খুলে উপভোগ করার জন্যে।



ঢেনকানল-কপিলাস থেকে জোরানডা-সপ্তশয্যায়



ঢেনকানল জেলার সদরের নামও ঢেনকানল। কটক থেকে এর দূরত্ব এই ৬০ কিলোমিটারের মতো। কটক-সম্বলপুর রাস্তায় (এন এইচ ৪২) ওপর পড়ছে। এই ঢেনকানল খুঁটি করেই পর্যটকরা কপিলাস, জোরানডা, সপ্তশয্যা আর টিকারপাড়া যান। কেননা, এই শহরে সব রকম ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগের প্রধান কেন্দ্রই এই ঢেনকানল। সবসেরা বেড়াবার সময় অক্টোবর থেকে মে মাস।

ঢেনকানলে বহু মন্দির ছড়িয়ে। তারমধ্যে প্রধান হলো বলভদ্রের মন্দির। ১৭০০ খৃষ্টাব্দের প্রথম পাদে তৈরি। শম্ভুগোপাল আর রঘুনাথের মন্দিরও আছে।

ঢেনকানল থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে পড়ে কপিলাস পাহাড়শ্রেণী। সেই পাহাড়চূড়ায় বিখ্যাত শিবমন্দির। মন্দিরটি ৬০ ফুট উঁচু। কথিত, রাজা তৃতীয় নরসিংহদেব এটি তৈরি করান। আনুমানিক সময় ১৩৩৫-৩৬ খৃঃ অঃ। মন্দির ছাড়া, প্রাচীন কিছু

গুহা আর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। পাহাড়ের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে জায়গায় জায়গায় ঝর্ণা-প্রপাত, পাহাড়ি নদীরেখা। বারো শ সিঁড়ি উঠে মন্দিরের সামনে পৌছানো যাবে।

পিকনিক-স্পট সর্বত্র। ঢেনকানল থেকে সকালে-বিকালে বাস। নতুন ডাকবাংলো তৈরি হয়েছে। দুটো স্যুইট। একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার (আর এবং বি), ঢেনকানল (পোঃ+জেলা) এঁকে লিখে বাংলোর রিজারভেশন নিতে হবে। শাকাহারীদের জন্যেই এই বাংলো। অহিন্দুদের মন্দিরে ঢোকা নিষিদ্ধ।

কপিলাসে শিবরাত্রি সবচেয়ে পবিত্র উৎসব। তিনদিন ধরে চলে উৎসব আর মেলা। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে তীর্থযাত্রীরা এসে ঐ তিনদিন কপিলাসে জড়ো হন।

জোরানডা ঢেনকানল থেকে ২৪ কিলোমিটার। মাহিমা-ধর্মের পীঠস্থান এই জোরানডা। মাহিমা গোঁসাইএর সমাধি দেখতে বহু লোক প্রতিদিনই জোরানডা ছুটছেন। মন্দিরের ভিতরে এই সমাধি। মাঘী পূর্ণিমার উৎসব সবচেয়ে বড়ো উৎসব। তিনদিন ধরে চলে। মাহিমা সম্প্রদায়ের সাধুসন্ত দর্শনে ঐ দিন বহু বিদেশী ট্যুরিষ্ট এখানে আসেন। এখানে জাতিধর্মনির্বিশেষে সবারই মন্দিরে প্রবেশাধিকার আছে।

টিকারপাড়া জঙ্গল উড়িষ্যার অন্যতম বিখ্যাত জঙ্গল। মহানদীর ভয়ংকর খাদ, বন্যজন্তু এবং দুর্গম জঙ্গল টিকারপাড়ার প্রধান ট্যুরিষ্ট আকর্ষণ। বহু বিদেশী ট্যুরিষ্ট প্রতি বছর এখানে আসেন। ডাঃ বাসটারডের সহযোগিতায় এখানে সম্প্রতি এক কুমীর প্রকল্প শুরু হয়েছে। 'ঘড়িয়াল কুমীর সাংকচুয়ারি' নামের এই প্রকল্পও নিঃসন্দেহে ট্যুরিষ্ট আকর্ষক। ঢেনকানল থেকে ১০৬ কিমি পথ। মোটরের রাস্তা চমৎকার। পৃথিবীতে এই প্রথম একটি সাংকচুয়ারি যেখানে বন্দিনী কুমীরকে তা দিয়ে ডিম ফোটানো হচ্ছে। আর একটি প্রকল্প শুরু হয়েছে। সুন্দরবনের ভাগবতপুরে। সেখানে

ডিম কৃত্রিমভাবে ফোটানো হয়েছে। ৪২টি ডিম থেকে ৩৯টি বাচ্ছা কুমীর বেরিয়েছে। তাদের লালনপালন করা হচ্ছে। প্রকল্পের বয়স মাস চারেক।

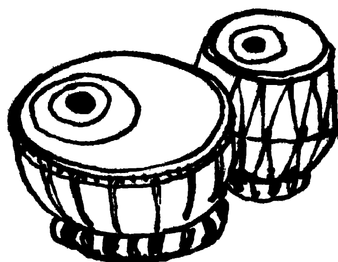
সপ্তশয্যা ঢেনকানল শহর থেকে ১১ কিমি। অরণ্য সৌন্দর্যই প্রধান। প্রবাদ আছে, পাণ্ডবেরা এই অঞ্চলের শোভায় মুগ্ধ হয়ে এখানে কিছুকাল কাটাতে বাধ্য হয়েছিলো। সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং রঘুনাথ মন্দিরের জন্য সপ্তশয্যা বিখ্যাত।

থাকার জায়গা, সারকিট হাউস: দুটি স্যুইট, রিজারভেশন কালেকটর, ঢেনকানলের হাতে। পি ডবলু ডাকবাংলোর রিজারভেশন একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার, ঢেনকানলের হাতে। এছাড়া, রেভিনিউ, জিলা পরিষদ প্রভৃতির বাংলো আছে। কটক-তালচের লাইনে পড়ে।

‘ঢেনকা’ নাম নিয়ে মতপার্থক্য আছে। তবে, যতদূর জানা যায়, এক সময় শবর সেনাপতি ঢেনকার অধীন ছিলো এইসব অঞ্চল। প্রতিবেশী রাজা শ্রীধর ভঞ্জ ঢেনকাকে যুদ্ধে হারান। ঢেনকার শিরশ্ছেদ হয়। হতে পারে, ঢেনকার নাম থেকেই আজকের ঢেনকানল হয়েছে।

মন্দিরময় জাজপুর

(বিরজাক্ষেত্র)



ইতিহাসে কয়েক শতাব্দী ধরে 'জাজনগর' নামেই খ্যাতি। প্রাচীন ওড়িশার সৌভাগ্যবতী রাজধানী। এ যে শুধু ভৌমকর রাজাদের রাজধানীই ছিলো তা নয়, বর্ধিষ্ণু বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবেও যথেষ্ট নামডাক ছিলো এর। হিউয়েন সাঙ যখন এই জাজনগরে পৌছান, তখন এর সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ইতিহাসের বহু উত্থান পতনের সাক্ষী এই জাজপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিরজা বা দুর্গা। ওড়িশার পবিত্র তীর্থক্ষেত্রের একটি। ঐতিহাসিক এই জাজপুর বৈতরণী নদী তীরে ছবির মতন শহর।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের জাজপুর রোড নামে আর একটি ষ্টেশনই আছে। এখানে নেমে সড়কপথে ১৯ কিলোমিটার পাকা রাস্তা। ওড়িশা রাজ্য পরিবহণের নিয়মিত বাস আছে ভুবনেশ্বর, কটক কেওঞ্ঝর আর বালেশ্বর থেকে। ষ্টেশন থেকে ট্যাক্সি মিনিবাস সব কিছুই পাবেন।

জাজপুরের আর একটি নাম বিরজাক্ষেত্র। দেবী বিরজার মূর্তি, স্থানীয় লোকেদের দাবি, ওড়িশার সবচেয়ে প্রাচীন দেবমূর্তি।

পুরনো মন্দির যেখানে, তা নাকি সেই মহাভারতের যুগ থেকেই ছিলো। বর্তমান মন্দির অনেক অর্বাচীন—চতুর্দশ শতাব্দীর বলে অনুমান করা হয়।

অখণ্ডলেশ্বর এবং অঙ্গেশ্বর মন্দির—বিরজাদেবীমন্দির ছাড়াও জাজপুরে কেনো পর্যটক যদি যান তাহলে তিনটি বিখ্যাত শিবমন্দির দেখে আসতে ভুলবেন না। অখণ্ডলেশ্বর, অঙ্গেশ্বর ছাড়াও ত্রিলোচনেশ্বরের মন্দির। অখণ্ডলেশ্বরের মন্দিরের ভিতরে একটি নগ্ন মূর্তি জৈন তীর্থংকরের। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়—অবিশ্বাস্য বলে মনে হলেও আমরা দেখে এসেছি, অঙ্গেশ্বরের লিঙ্গমূর্তি সারা দিনের মধ্যে প্রতি তিন ঘণ্টায় রং বদল করেন।

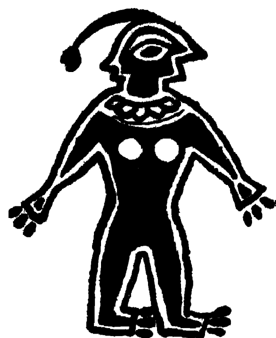
বৈতরণীর তীরে জগন্নাথদেবের মন্দির এবং একটি অতি প্রাচীন কালী মূর্তি আছে।

নদীর মাঝখানে একটি দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপে বিষ্ণুর বরাহ মূর্তি সহ বরাহমন্দির। ১৪৯৭-১৫৩০ খৃঃ রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বকালে প্রতাপরুদ্র এটি তৈরি করান। চৈতন্যদেব ১৫১০ খৃঃ এখানে এসেছিলেন! বেশ কয়েকটি সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরে পৌঁছতে হবে। এই সিঁড়িগুলির নাম দশাশ্বমেধ ঘাট।

শহরের মাঝখানে একটি ১৭ শতকের মসজিদ আছে। হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে তা তৈরি। বেশ কিছু হোটেল আছে থাকা-খাওয়ার। ইনসপেকশন বাংলো আছে। একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার (আর বী)-কে লিখে থাকার অনুমতি পাওয়া যাবে। খাবার ব্যবস্থা নেই। তবে ভুবনেশ্বর এবং কটক থেকে সকালে গিয়ে দেখে শুনে সন্ধের মধ্যে ফিরে আসা যায়। বিশদ বিবরণের জন্যে ভুবনেশ্বর ট্যুরিস্ট অফিসে যোগাযোগ করা যেতে পারে।



কিচিং





কিচিং-এর নাম বিশেষ কেউ শোনেন নি। ময়ূরভঞ্জে ভঞ্জ রাজাদের প্রথমদিকের রাজধানী ছিলো এই কিচিং। এখন একে গ্রাম ছাড়া কিছু বলা যায় না। বালেশ্বর থেকে ২১০ কিলোমিটার, বারিপদা থেকে ১৪৫ আর বাদামপাহাড় রেলস্টেশন থেকে মোটে ৬৭ কিমি। দেবী কীচকেশ্বরী নাম থেকেই মনে হয় জায়গার নাম হয়েছে কিচিং। কীচকেশ্বরী রাজাদের পারিবারিক দেবীমূর্তি। বর্তমান মন্দিরটি নতুন করে ১৯২৫ সালে তৈরি করা হয়েছে। উচ্চতা ৭৫ ফুট। খুব বেশি মন্দির ক্লোরাইট পাথরে তৈরি নয়। এটি ক্লোরাইট পাথরে তৈরী।

কিচিং-এর ধ্বংসাবশেষের শুরু খৈরীবন্ধন নদীতীর থেকে দক্ষিণে খণ্ডখৈরী পর্যন্ত। খৈরীর জল গিয়ে বৈতরণীতে পড়ছে।

কিচিং-এ ঢুকতেই আপনার সামনে পড়বে শিব নীলকণ্ঠেশ্বরের মন্দির। নাগর-শৈলীতে তৈরি।

ঠাকুরাণীশালা — কিচিং-এর পুরনো ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরগুলি নিয়ে গোটা চত্বরের নাম। চামুণ্ডা মূর্তির নামই কীচকেশ্বরী। অহিন্দুদের মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ।

বড় দেউলা—মাটি খুঁড়ে এখান থেকে অনেক পুরনো মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। শিল্পসৌন্দর্য রীতিমতো বিস্ময়কর। কিছু কিছু মূর্তি নষ্টও হয়েছে। খণ্ডিয়া দেউলা মন্দিরের সামনের দরজা মনে করা হয় বড় দেউলা খনন থেকেই পাওয়া। দরজার নিচে গঙ্গা-যমুনার মূর্তি।

খণ্ডিয়া দেউলা ছাড়া চন্দ্রশেখর মন্দিরটি ভারহুত-রীতিতে ১৪-টি স্তম্ভ ছাদ ধরে রেখেছে। হলঘরের মতো চেহারা। পুজোপাঠ এখানে হতো বলে মনে হয় না।

একটি সুশৃঙ্খল মিউজিয়াম আছে। কিচিং বা তার আশপাশ থেকে নানারকম মূর্তি, ডোর-প্যানেল, যা কিছু পাওয়া গেছে, তা এই মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

থাকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটু খোঁজ দিই :

(১) ইনসপেকশন বাংলো—একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার (পি ডবলু ডি) বারিপদা, ময়ূরভঞ্জ।

(২) রেভিনিউ রেস্ট হাউস, সুক্রুলি—জেলাশাসক, বারিপদা

কেওঞ্ঝরের বাস কলকাতা থেকে ছুটো ছাড়ে। তাতে চড়ে করঞ্জিয়া। করঞ্জিয়া থেকে কিচিং বাস আছে। এখন যশীপুর থেকেও মিনি বাস চলছে। অসুবিধা হবে না।



হরিশংকর





বলাঙ্গীর জেলায় এমন এমন জায়গা আছে, যা দেখলে তাক লেগে যাবে। হরিশংকর তেমনি একটি জায়গা। তীর্থক্ষেত্র তো বটেই, সৌন্দর্যখনি বললেও অত্যুক্তি হয় না। পাটনাগড় সাবডিভিশনের খাপড়াখোল থানার অধীনে এই হরিশংকর। নামটা একটু বিচিত্র, না ?

গন্ধমাদন পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে হরিশংকর আর উত্তর ঢালে বিখ্যাত নৃসিংহনাথের মন্দির। যাঁরা অ্যাডভেনচার পছন্দ করেন, তাঁরা এই দুটো জায়গাতেই হেঁটে যেতে পারেন। গভীর বনের মধ্যে পায়ে হাঁটার বিপদ আছে সমূহ। বিপদ আছে বলেই তো মজা। ১৬ কিলোমিটার পথ। পাহাড়ি পথ। উপত্যকার নামটা আরো অদ্ভুত। পো-লো-মো-লো-কি-লি কিংবা এক কথায় পরিমলগিরি। প্রাচীন বুদ্ধ বিহার।

হরিশংকর নামটি আশ্চর্যজনকভাবে মিলনাত্মক। হরি অর্থাৎ বৈষ্ণববাদী, শংকর শৈব। দুটি প্রধান ধর্মসংস্কৃতি এই নামের মধ্যে

মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। মন্দিরটি পঞ্চদশ শতকের। ভিতরে শংকর এবং বিষ্ণুমূর্তি। নৃসিংহ মূর্তিরও পুজো হয়, অন্য একটি জায়গায়।

বিভিন্ন ধর্মের অন্তর্নিহিত সহনশীলতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছিল রাণীপুর-ঝরিয়ালে। তারই রেশ এই হরিশংকরে এসে পৌঁচেছে! রাণীপুর ঝরিয়ালে একসঙ্গে বৈষ্ণব, শৈব, বৌদ্ধ, তন্ত্র—সব ধর্মের সমন্বয় ঘটেছিলো একদিন।

তীর্থক্ষেত্র ছাড়া হরিশংকরের বাড়তি সৌন্দর্য, আগেই বলেছি, অরণ্য আর ঝর্ণার। পাপনাশিনী নামের প্রপাতটিও সুন্দর। এই প্রপাতের জল গ্রাফাইট পাথরের বন্দিত্ব মেনে নিয়ে হ্রদ তৈরি করেছে। এর জলে স্নান করে তীর্থযাত্রীরা পুণ্যার্জন করেন।

হরিশংকরের উচ্চতা ১২৭০ ফুট। শৈলাবাস হিসেবে সত্যিই আদর্শ জায়গা। গ্রীষ্মে বলাঙ্গীর যখন ১১৮.০° ফারেনহাইটে পুড়ছে এখানে জঙ্গলে ঝর্ণা প্রপাতের ধারে তখন রমণীয় আবহাওয়া। বলাঙ্গীরের দার্জিলিং বলে বলাঙ্গীরের মানুষ এই হরিশংকরকে।

দেখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হরিশংকর, ভৈরবী, আর প্রভু জগন্নাথের মন্দির। ভৈরবী মন্দিরের মধ্যে একটি ছোট পাথরের মূর্তির গায়ে প্রোটো-ওড়িয়া স্ক্রিপ্‌ট খোদাই করা অনুশাসন।

গঙ্গার মর্ত্যে আগমন নিয়ে এক সুন্দর ভাস্কর্য। বিষ্ণুর পাদপদ্ম থেকে নিঃসৃত হয়ে শিবের মাথায় গঙ্গার প্রপাত।

পাপনাশিনী প্রপাতের পাশে গণেশের নৃত্যরত মূর্তিটিও ভারি চমৎকার।

গন্ধমাদন আর হরিশংকরে দুটি মৃগদাব বা ডিয়ার পার্ক তৈরি করা হয়েছে। সেখানে নানা জাতের হরিণ সংরক্ষণ হচ্ছে। প্যানথার আছে। ময়ূর ময়না তো অফুরন্ত।

এছাড়া, হরিশংকরে বিভিন্ন বনৌষধি তৈরি করার জন্যে গাছলতা গুল্মের চাষ হচ্ছে। এসব দেখতে কোনো পয়সাখরচ অর্থাৎ প্রবেশমূল্য নেই। মন্দিরে অহিন্দুদের প্রবেশ নিষেধ।

লাখোর রেলষ্টেশন সব থেকে কাছে। হরিশংকর থেকে ৪৮ কিলোমিটার। এখন লাখোরের নতুন নাম হয়েছে হরিশংকর রোড। আর আছে বলাঙ্গীর। ৪৮১ কিলোমিটার দূর হরিশংকর থেকে।

বলাঙ্গীর থেকে ভাড়ার ট্যাক্সি মিনিবাস পাওয়া যেতে পারে। বলাঙ্গীর থেকে সড়ক পথে যাওয়াটাই সবচেয়ে সহজ। ওড়িশা আর মধ্যপ্রদেশের বড় বড় শহরের মধ্যে বলাঙ্গীরের সড়কপথে যোগ খুবই ভালো।

সড়কপথে বলাঙ্গীর——

সম্বলপুর থেকে	১৩৬ কিলোমিটার
রায়পুর ,,	২৯৮ ,,
ভুবনেশ্বর ভায়া সম্বলপুর ,,	৪৫৭ ,,
ভুবনেশ্বর ভায়া বৌধ ,,	৩২৫ ,,
রাউরকেল্লা ,,	৩২৮ ,,
টিটিলাগড় ,,	৬৭ ,,

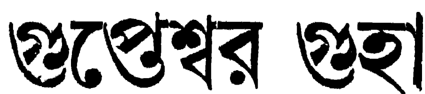
বলাঙ্গীরের ট্যুরিস্ট অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। অনেকসময় হরিশংকর বা শোনপুরে এই দফতর কনডাকটেড-ট্যুরের ব্যবস্থা করেন।

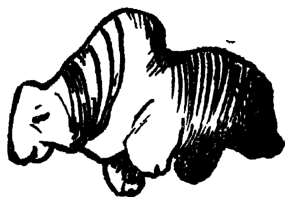
হরিশংকরে কোথায় থাকবেন ?

(১) বনবাংলো	২টি স্যুইট	রির্জাভেশন, ডি এফ ও,	বলাঙ্গীর
(২) রেভিনিউ রেস্টশেড	২টি ,,	,, এস ডি ও,	পাটনাগড়
(৩) পান্থনিবাস (পঞ্চায়েতসমিতিবাংলো)	৩টি	,, বি ডি ও,	খাপড়াখোল

এই বাংলোর কোনটাতেই বিজলী নেই। জল আছে। চৌকিদার রান্নার ব্যবস্থা করে দেবে। শিবরাত্রি বিরাট উৎসব। এছাড়া, নৃসিংহ চতুর্দ্দশী। বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে।









প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এমন খনি ওড়িশায় খুব কমই আছে। রামগিরি অরণ্যাঞ্চল ধরে ১৫ কিলোমিটার পূবে এগুতে হবে। দুপাশে ঘন গভীর শাল জঙ্গল। মাঝখানে সুঁড়িপথ। সেই সুঁড়িপথ ধরে এগুলে সামনে চুনা পাথরের পাহাড়। তার চূড়ায় উঠলে তবেই গুপ্তেশ্বর গুহা। চুনাপাহাড়ের নিচ থেকে চূড়ায় ওঠার পথের দুপাশে অনিন্দ্যসুন্দর চাঁপা গাছের সার। সারবদ্ধ চাঁপা না বলে, বরং বলা ভালো, দুপাশে চাঁপার জঙ্গল। তার ভিতর দিয়ে গুহায় পৌঁছুবার পথ। গুহার সামনে দাঁড়ানো ছ ফুট শিবলিঙ্গ।

গুপ্তেশ্বর শিব। সত্যিই গুহার মধ্যে দীর্ঘকাল গুপ্ত ছিলেন।

গুপ্তেশ্বর যেতে সড়কপথই ভরসা। জয়পুর থেকে ৪২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। ২৪ কিমি অর্থাৎ বইপারিগুদা পর্যন্ত রাস্তা পাকা। তারপর বাকি ৩৫ কি মি মেঠো পথ। রেলস্টেশন বলতে সেই রায়গাড়া। রায়পুর-ভাইজাগ শাখা লাইনে পড়ে।

মাটি থেকে পাঁচশ ফুট উঁচুতে এই গুপ্তেশ্বর গুহা। এখন সিঁড়ি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে এই গুপ্তেশ্বরের নাম গুপ্তকেদার। রামায়ণে এর উল্লেখ আছে। রামচন্দ্র এসেছিলেন বলেএই পাহাড়শ্রেণীর নাম রামগিরি। এখানে বোনডা উপজাতির বাস।

এই উপজাতির স্ত্রীপুরুষ নগ্ন হয়ে থাকে। সুন্দর একটা গল্প আছে এ নিয়ে। সীতা তমসা নদীতে স্নান করছিলেন। তখন এই উপজাতির কেউ তাঁকে দেখে হেসে ফেলে। সীতার অভিশাপেই এরা বস্ত্রহীন, অনাবৃত। মালকানগিরির কাছে, বনের একটা অংশের নাম পঞ্চবটী।

গুপ্তেশ্বরেই একটা ছোটখাট বিশ্রামাগার আছে। তবে সেখানে না থেকে জয়পুর ইনসপেকশন বাংলোয় থাকাটাই সবদিক থেকে সুবিধাজনক। সেখানে একটা অতিথিশালাও আছে। জয়পুর ওখান থেকে ৪২ কিলোমিটার।

রামগিরি পাহাড়ের মাথায় একটা ইনসপেকশন বাংলো আছে। জয়পুরের একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ারকে লিখে রিজারভেশন করা যাবে। জয়পুর গেস্ট হাউসের জন্যে প্রাক্তন মহারাজা জয়পুর, পোঃ জয়পুর, ওড়িশা—এ ঠিকানায় লিখে থাকার ব্যবস্থা করা যায়।

ডুডুমা

কোরাপুট জেলায় জয়পুর থেকে দক্ষিণে ৬৫ কিলোমিটারের মাথায় পড়বে ডুডুমা। ওড়িশার হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্টগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সার্থক এই প্রকল্প।

ডুডুমা জলপ্রপাতের আরেকটা নাম হলো মাছকুণ্ড। ডুডুমার সবচেয়ে কাছের বিমানবন্দর হলো ভাইজাগ বা ভিজাগাপত্তনম্। ভিজাগাপত্তনম থেকে ভুবনেশ্বর নিয়মিত বিমান চলাচল করে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের রায়পুর ভিজাগাপত্তনম্ শাখা লাইনের উপর রায়গাড়া ডুডুমার কাছের রেলস্টেশন।

মাছকুণ্ড শহরের সঙ্গে জয়পুর আর কোরাপুটের নিয়মিত বাস যোগাযোগ আছে। মাছকুণ্ড থেকে জয়পুর ৬৫ কিলোমিটার। কোরাপুট ৭০ কিলোমিটার।

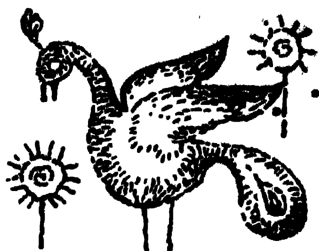
এই জলপ্রপাত না দেখলে জীবনে একটা বড়ো ফাঁক রয়ে যাবে মাছকুণ্ড চলতি নাম, ভালো নাম মৎস্যতীর্থ। এই নামেই এর খ্যাতি। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তীর্থযাত্রীরা এখানে সমবেত হয়। এ-জায়গার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের নাম জড়িত। ষোড়শ শতকে, অনেকে বলেন, তিনি এখানে এসেছিলেন।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগানোর ফলে জলপ্রপাত তার পুরনো ঐশ্বর্য কিছুটা হারিয়ে ফেলেছে সন্দেহ নেই। তবু, এর প্রাকৃতিক পরিবেশের তুলনা হয় না।

থাকার জায়গা ডুডুমায় নেই। চিকেনপুট এবং ছাকাডাল্লিতে দুটি ইনসপেকশন বাংলো আছে। কোরাপুটের পি ডবলু ডি-র একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ারকে লিখে আগে থেকে রিজার্ভেশন নিয়ে থাকা যেতে পারে।



ধৌলি





ভুবনেশ্বর থেকে দশ কিলোমিটার দক্ষিণে। দয়া নদীর পাড় থেকেই খাড়া হয়ে উঠেছে ধৌলি পাহাড়। ভুবনেশ্বর থেকে ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে গেলেই পড়বে ধৌলি পাহাড়। প্রকৃতপক্ষে, এখানেই গোটা এশিয়ার ইতিহাস বদলে গেছে। আজ থেকে ২ হাজার বছর আগে এখানেই বিখ্যাত কলিঙ্গ যুদ্ধ হয়েছিলো। এখানেই অশোক ধর্মাশোকে পরিণত হন। পাহাড়ের গায়ে শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। শিলালিপি ছাড়াও যা আছে তা হলো শিলালিপিগুলির উপরে পাহাড় কেটে হাতির মূর্তি। এগুলোই ওড়িশার সবচেয়ে প্রাচীন ভাস্কর্যের চিহ্ন। তার প্রকৃতিগত রাজকীয়তা এখনও অবিনশ্বর। কোথাও কিছু নষ্ট হয় নি। দু দুটো শতাব্দীর রোদ বৃষ্টি ঝড় এগুলোর উপর দিয়ে বয়ে গেছে।

সম্প্রতি ধৌলির পাহাড়ের চূড়ায় একটা শান্তিস্তূপ তৈরি করা হয়েছে। এর চারকোণে ভগবান বুদ্ধের চার দণ্ডায়মান মূর্তি। দেয়ালের গায়ে বুদ্ধ, অশোকের জীবনীর কিছু কিছু চিত্ররূপ। এর সঙ্গে কলিঙ্গ যুদ্ধের কয়েকটি ঘটনা খোদাই করা হয়েছে।

শান্তিস্তূপের ঠিক সামনেই ধবলেশ্বর মন্দির। ভাঙচুর সারিয়ে এখন মোটামুটি ভালো অবস্থায়। কথিত আছে, সোমবংশী রাজাদের

কেউ এই মন্দির তৈরি করান। হাজার বছরের বেশি পুরনো এই মন্দির এক পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র।

ধৌলিতে থাকার কোনো জায়গা নেই। ভুবনেশ্বর থেকে এতো কাছে, ফলে পর্যটকরা ভুবনেশ্বরে পা রেখে ঘুরবেন। সেটাই সুবিধা।

ভুবনেশ্বরে পশ্চিমী কেতার থাকার জায়গা :

(১) স্টেট গেস্ট হাউস —সুপারিনটেনডেনট, স্টেট হাউস, রিজারভেশন-কর্তা
ফোন নম্বর-৫০৬৮৩

(২) ট্রাভেলার'স লজ —আই টি ডি সি ম্যানেজার
ফোন ৫০৭৪৫

অন্যান্য থাকার জায়গা :

(১) ট্যুরিস্ট বাংলো —ট্যুরিস্ট অফিসার,
ফোন ৫০০৯৯

(২) হোটেল রাজমহল —ম্যানেজার, ফোন ৫২৪৪৮

(৩) হোটেল পুষ্পক —ম্যানেজার, ফোন ৫০৫৪৫

এছাড়া, (১) রেলের রিটায়ারিং রুম—স্টেশন মাস্টার, ভুবনেশ্বর,
ফোন ৫২২৩৩

(২) সারকিট হাউস —এ ডি এম, ভুবনেশ্বর

(৩) ইনসপেকশন বাংলো —একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার (আর এ্যাণ্ড বী) ভুবনেশ্বর

চাকাপাদ





চাকাপাদ বিখ্যাত, প্রভু বিরুপাক্ষ মন্দিরের জন্যে। সমুদ্রপিঠ থেকে হাজার ফুটের কাছাকাছি উঁচু। জেলা ফুলবনী। মন্দিরের কোলের কাছে বয়ে যাচ্ছে রুতাঙ্গ নদী। টাকারা হয়ে মহানদীতে গিয়ে পড়ছে। নদীর উৎস, এখন যাকে বলে বস্তিঙ্গিয়া ব্লক হেড কোয়ার্টার, তার খুব কাছে। সারাবছর নদীতে জল।

বিরুপাক্ষ সমতলের মানুষ আর আদিবাসী উভয়েরই দেবতা। রামায়ণে চাকাপাদের উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিকভাবে, যতটা নয়, এই অঞ্চলের সুখ্যাতি পৌরাণিক। প্রাকৃতিক পরিবেশও খুব সুন্দর। ৫ বর্গমাইল আয়তন চাকাপাদের। ১৯৭১-এর জনগণনার হিসাবমতো এখানে ৮৭৬ জনের বাস। এখানে আসার সবচেয়ে ভালো সময় অক্টোবর থেকে জুন। বেরহামপুর-গঞ্জাম সবচেয়ে কাছের ষ্টেশন। সড়কপথে টিকাবালি থেকে আসতে হবে। টিকাবালি থেকে বাস আছে। সাইকেল রিকশা আর গরুর গাড়ি একমাত্র যোগাযোগের বাহন। বিশ থেকে পঁচিশ টাকা খরচা।

চাকাপাদে থাকার ব্যবস্থা নেই। টিকাবালিতে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের রেস্ট-শেড আছে। চাকাপাদ থেকে টিকাবালির

দূরত্ব ১৮ কিলোমিটার। আরেকটি থাকার জায়গা পাওয়া যাবে, একটু দূরে—কলিঙ্গে। চাকাপাদ থেকে কলিঙ্গ ২৯ কিলোমিটার। কলিঙ্গে পি ডবলু ডির বাংলো আছে। টিকাবালিতে স্টেট ব্যাংকের শাখা আছে। এ অঞ্চল সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহের জন্যে ফুলবনীতে জেলা পি আর ও-র অফিস আছে।

মাঘী পূর্ণিমার দিন এখানকার সবচেয়ে বড় উৎসব। মাঘ ইংরেজি জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আদিবাসী মেয়েপুরুষরা জমকালো পোষাক পরে এখানে জড়ো হয়। দলে দলে নাচ শুরু করে। এক সময় আলাদা দল বলতে আর কিছু থাকে না। তখন পুরো নাচটাই এক হিল্লোলিত জনসমুদ্র। না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।



হীরাকুঁদ





মহানদীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের ১৫ মাইলের মাথায় হীরাকুঁদ। পৃথিবীতে নদীবন্দী এতো বড় ড্যাম আর নেই। সম্বলপুর থেকে ১৬ কিলোমিটার। হীরাকুঁদ একটি সর্বার্থসাধক নদী-উপত্যকার প্রকল্পের নাম। বন্যানিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সেচ—এই তিনমুখী কার্যক্রম নিয়ে এই হীরাকুঁদ প্রকল্প।

যে বাঁধাজলের হ্রদটি তৈরি করা হয়েছে তার আয়তন ২৮৮ বর্গমাইল। ড্যাম সাইড থেকে নদীর সঙ্গে উজিয়ে ৫০ মাইল যেতে হবে। এশিয়ার মধ্যে এতো বড়ো কৃত্রিম হ্রদ আর কোথাও নেই।

প্রাচীনকালের কোন এক সময়ে এখান থেকে হীরক সংগ্রহ করা হতো। সেই থেকে এর নাম হীরাকুঁদ।

মূল ড্যাম ৫ কিলোমিটার। দুধারে বাঁধ। এছাড়া টিলার মাথায় উঁচু মিনার একটা তৈরি হয়েছে। নাম গান্ধীমিনার। এর উপর উঠে পর্যটকগণ হীরাকুঁদ হ্রদের দৃশ্য উপভোগ করতে পারেন।

পশ্চিমদিকে আরেকটি মিনার করা হয়েছে। নাম জওহর মিনার। মূল ড্যামের ঠিক নিচেই একটা ছোটখাট দ্বীপ।

পিকনিক করা যেতে পারে। আরামসে আড্ডা মারা যেতে পারে। হীরাকুঁদে অনুমতি না নিয়ে ঢোকাই নিষিদ্ধ। এই অনুমতি ডি এস পি, হীরাকুঁদ সিকিউরিটি ফোরসের কাছ থেকে নিতে হবে। হীরাকুঁদে নেওয়া যেতে পারে, অথবা বারলায়। ছবি তোলা একদম নিষেধ।

সম্বলপুর থেকে সড়কপথে বা রেলপথে হীরাকুঁদ পৌঁছুতে পারা যাবে।

থাকবেন কোথায় ?

(১) অশোকনিবাস		রিজারভেশন : সুপারিনটেনডিং
(ডিলুক্স)	৪।৮ স্যুইট :	ইনজিনিয়ার হীরাকুঁদ ড্যাম সারকেল, বারলা
(২) বারলা রেস্ট হাউস		
(প্রথম শ্রেণী)	৮টি ,,	,,

এছাড়াও সারকিট হাউস আর পি ডবলু বাংলো আছে সম্বলপুরে। ওখানে একটি ট্যুরিষ্ট বাংলোও তৈরী হয়ে গেছে। কীভাবে কী করবেন, সে ব্যাপারে ট্যুরিষ্ট অফিসার, সম্বলপুর, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

প্রধানপট

বোনাইগড়ের দক্ষিণ-পূর্বে ১৯ কিলোমিটার যেতে হবে। রাস্তা বর্ষায় একেবারে অচল। ঐ রাস্তা ধরে গেলেই চোখে পড়বে বিখ্যাত খাণ্ডাহার ওয়াটার ফলস। শেষের দিকের দেড় কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দিতে হবে এছাড়া গত্যন্তর নেই। সবুজ বন পাহাড় আর ঘন ঘাস জমির মধ্যে প্রকৃতি প্রেমী মানুষের আদর্শ জায়গা বেড়াতে আসার।

৮০০ ফুট উপর থেকে নিচে জল গড়িয়ে পড়ছে। পাহাড়ের মাথায় চড়ে এই দৃশ্য উপভোগ করার মতন সৌভাগ্য খুব কম পাওয়া যাবে।

পিকনিকের জন্যে অতি উত্তম জায়গা। খাণ্ডাহার আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল। পর্যটকগণ তাদের জীবন যাপন সম্বন্ধে উৎসাহবোধ করলে প্রধানপটের সঙ্গে খাণ্ডাহারকেও জুড়ে নিতে পারেন। রাউর কেলা থেকে খাণ্ডাহার কাছেই।

এসব জায়গায় পর্যটকরা সহজে যেতে পারেন না। তার কারণ এর নিশানা বা হদিশ প্রায় কারোরই জানা নেই। যদি সামান্য খোঁজ-খবর করে কেউ যেতে পারেন, তাহলে তাঁর স্মৃতিতে একটা স্থায়ী ছবি রয়ে যাবে, এ-ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ।

নৃসিংহনাথের মন্দিরে

সম্বলপুর থেকে গন্ধমর্দন পাহাড় ১৪০ কিলোমিটার। সেই পাহাড়ের পাদদেশে এই নৃহিংহনাথের মন্দির। আরেক পাদদেশে বিখ্যাত হরিশংকর মন্দির, জলপ্রপাতের পাশেই। স্থানীয় লোক মনে করেন, হনুমান হিমালয় থেকে যে পাহাড়ের টুকরো পিঠে করে

বয়ে নিয়ে আসেন, এই সেই গন্ধমর্দন। যাতে বিশল্যকরণী ছিলো। লক্ষ্মণ এই বিশল্যকরণী প্রয়োগেই বেঁচে উঠেছিলেন। এই পাহাড়ে বনৌষধি যে কত রকমের আছে, তা বিশেষজ্ঞ মাত্রেই জানেন। মন্দির তীর্থভূমির টান ছাড়াও সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে পর্যটক মাত্রেই মুগ্ধ হবেন।

এই নৃসিংহদেবের মন্দির ১৫০০ খৃঃ বৈজলাদেব তৈরি করান। দেবতা মার্জাকেশরী—মুখমণ্ডল মার্জার বা বিড়ালের দেহের বাকি অংশ সিংহের। স্থানীয় পুঁরোহিতের ব্যাখ্যা ঃ এই মার্জারকেশরী মূষিকদৈত্যের অপেক্ষা করে আছেন। মূষিকদৈত্য গর্ত থেকে বেরুনো মাত্র, তাকে হত্যা করবেন। অহিন্দুদের মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ।

মূল মন্দিরের চতুর্দিকে পাথর কেটে মূর্তি বসানো। সত্যিই দেখার জিসিস। এ ছাড়া আছে, পঞ্চপাণ্ডব ঘাট। চতুর্দিকে ছড়ানো ছেটানো ঝর্ণা আর জলপ্রপাত। পাহাড়ের মাথায় একটি বুদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ পর্যটক মাত্রেই দেখতে ভুলবেন না।

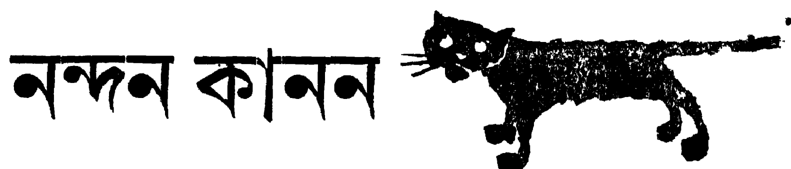
যাতায়াতের ব্যবস্থা সম্বলপুর থেকেই করতে হবে এবং শুধুই সড়ক পথে। রাস্তা ভালো। থাকা যাবে কোথায় ?

(১) পঞ্চায়েৎ সমিতির বাড়ি— একটা স্যুইট—রিজারভেশন :
বি ডি ও, পোঃ পাইকমল সম্বলপুর

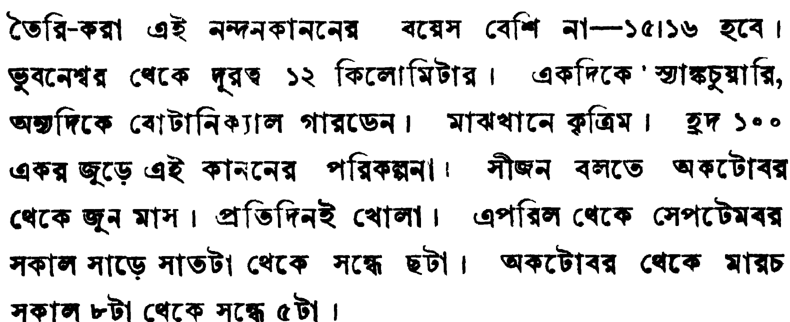
(২) পি ডবলু ডি ইনসপেকশন—২টা স্যুইট—রিজারভেশন
একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার, আর এ্যাণ্ড বী ডিভিশন
পোঃ বারলা

চৌকিদার খাবার তৈরি করে দেবে।

বারগড়ে সম্বলপুরী হ্যাণ্ডলুমের নানা কাপড় জামা পাওয়া যাবে। সব কিছুর ব্যবস্থার জন্যে, ট্যুরিস্ট অফিসার, পোঃ সম্বলপুর, ফোন ২৬৮—এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।



নন্দন কানন



তৈরি-করা এই নন্দনকাননের বয়েস বেশি না—১৫।১৬ হবে। ভুবনেশ্বর থেকে দূরত্ব ১২ কিলোমিটার। একদিকে স্যাঙ্কচুয়ারি, অন্যদিকে বোটানিক্যাল গারডেন। মাঝখানে কৃত্রিম। হ্রদ ১০০ একর জুড়ে এই কাননের পরিকল্পনা। সীজন বলতে অকটোবর থেকে জুন মাস। প্রতিদিনই খোলা। এপরিল থেকে সেপটেমবর সকাল সাড়ে সাতটা থেকে সন্ধে ছটা। অকটোবর থেকে মারচ সকাল ৮টা থেকে সন্ধে ৫টা।

মাথাপিছু ৩০ পয়সার টিকিট। মোটর জিপ পিছু ১ টাকা। ট্রাক, বাসের জন্য ঢুকতে ৩ টাকা। হাতি-চড়ার জন্যে জনপ্রতি ৫০ পয়সা।

হ্রদে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে, কাশ্মীরের ডাল-নাগিনে যেমন শিকারা, এখানেও তেমন শিকারা মিলবে। ঘণ্টায় ৫ টাকা। দুজনের বসার প্যাডলিং বোট ভাড়া ঘণ্টায় ৩ টাকা। চারজনের বসার বোট-ভাড়া ৬ টাকা। প্লাসটিক বোট দুটাকা ভাড়া ঘণ্টায়।

স্যাঙ্কচুয়ারিতে বাঘ সিংহ বাইসন হরিণ ছাড়াও কুমীর ময়ালসাপ আর নানারকমের পাখি। ফুলের বাগান একটা দেখার মতন জিনিস।

এছাড়াও ১৩৪ একরের বিশাল হ্রদ। বোটিং-এর ব্যবস্থা সেখানেই। বোটানিক্যাল গারডেনে বিভিন্ন রকম বনৌষধির চাষ করা হচ্ছে।

থাকার জায়গা কী আছে ?

(১) ট্যুরিস্ট কটেজ : সিঙ্গেল ৭ টাকা দিনে
ডবল ১০ টাকা „
বাসনকোসন, রান্নার ব্যবস্থা চৌকিদার বহাল।

(২) বনবিভাগের রেস্ট হাউস : দুটো ঘর, ৩.৭৫ টাকা মাথাপিছু + বিদ্যুতের খরচ, বাড়তি বিছানার ব্যবস্থা আছে।

রিজারভেশন অধিকারিক : ওয়াইলড লাইফ কনজারভেশন
অফিসার, কটক। ফোন ২৩৯৭৬
কিংবা,
এ্যাসিসটাণ্ট কনজারভেটর অব ফরেস্ট
নন্দনকানন। ফোন ৫১৫৮০

ভুবনেশ্বর থেকে নিয়মিত বাস আছে নন্দনকানন যাবার। তাছাড়া, হাওড়া-মাদরাজ মেন লাইনে রবাং স্টেশনে নেমে নন্দনকানন ৩ কিলোমিটার।

মিনিবাস, ট্যাক্সি, অটোরিক্সা আছে ভুবনেশ্বর থেকে। ভুবনেশ্বর ট্যুরিস্ট অফিসের ব্যবস্থা মতো ওদের নিজস্ব বাসে আড়াই টাকা প্রতি কিলোমিটারে,একঘণ্টা থামলে তার চারজ ৫টাকা। ট্যাকিস কিলোমিটার প্রতি ১ টাকা, দাঁড়ালে ঘণ্টায় ২ টাকা। অটোরিকশা ঘণ্টায় ৫০ পয়সা, দাঁড়ালে ঘণ্টায় ১টাকা। মিনিবাস ১.৫০ টাকা, থামলে ৩ টাকা। ট্যুরিস্ট দফতর থেকে কনডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা আছে। সপ্তায় দুবার। বৃহস্পতি আর শনি। মাথাপিছু ৯.২০ পয়সা। সকাল ৮টায় বেরুনো, সন্ধে ৬টায় ফেরা।



কেওঞ্ঝর জশীপুরে





চাঁদিপুর থেকে বালেশ্বর, বালেশ্বর থেকে বারিপদা জিপে। বারিপদায় আগেও এসেছিলাম। সার্কিট হাউসে ছিলাম। এবারেও সেই সার্কিট হাউস॥ পূর্বাঞ্চল সাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল সেবারে। ওড়িশার অনেক কবি সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সে বছর। বিস্তর তরুণ রচনা শুনেছি। ওড়িয়া হিন্দি আর বাঙলা থেকে সমবেত হয়েছিলেন অনেকেই সেবার। দুদিনের সম্মেলন। তখন ময়ূরভঞ্জ জেলা কবি সীতাকান্ত মহাপাত্রের শাসনে ছিলো॥ বারিপদা হেড কোয়াটার। এখন সে জায়গায় আছেন বিবেকানন্দ পট্টনায়ক। তাঁর সঙ্গে আলাপ ছিলো না, আলাপ হলো॥ সদালাপী সুজন এই অল্পবয়স্ক শাসক আমাদের সিমলিপাল পাঠাবার ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। বললেন, আজ রাতটা বারিপদা থাকুন, কাল সিমলিপাল ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ডিরেকটার এখানে আসার কথা। যদি আসেন, তবে ওঁর সঙ্গে চলে যাবেন। উনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন। আমি কথা বলবো।

বারিপদায় যেতে কলকাতা পুরী-কলকাতা বাস ধরুন সকালবেলা। দুপুর একটার ভিতর পৌঁছে যাবেন। সার্কিট হাউসে ঘর আছে অনেকগুলো। তার মধ্যে দুটো এয়ারকনডিশনড।

পাশাপাশি আর একটা মধ্যবিত্ত বাংলো পাবেন। হাইওয়ে বাংলো নতুন রং করা হয়েছে। একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, ন্যাশনাল হাইওয়ে ডিভিশন, বারিপদাকে লিখে থাকার অনুমতি নিতে হবে। সার্কিট হাউসে যা খাবেন আগে থেকে বলে দিতে হবে। রান্না চমৎকার। বিশাল সিমলিপাল জঙ্গলের সবচেয়ে কাছাকাছি পয়েন্ট এই বারিপদা থেকে—লুলুং। সেখানে ঝর্ণা আছে। সেই ঝর্ণার জলপান করতে আসে জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ার। মাইল তেরো চোদ্দ হবে।

রাস্তা খুব ভালো নয় শক্তপোক্ত জিপ না হলে মুশকিল। আর একটি পথ আছে ওদলার দিক থেকে। সভ্যিকার গেন বলতে এই ছুটি অঞ্চলেই মিলবে। মোটামুটি ছুরুহতার জন্যে মানুষ—এছুটি পথ দিয়ে কমই ঢোকে। লুলুং-এর দিকে ঝর্ণায় বিশাল বিশাল মাছ আপনার হাত থেকে মুড়ি খেয়ে যাবে। একটুও ভয় পেয়ে সরবে না। কারণ ওরা ঠাকুরের মাছ বলে বিখ্যাত। কেউ ওদের ধরে না, মারে না। তাই অকুতোভয়ে ঘুরে বেরায় জলে। না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

বিখ্যাত খৈরীর বাবা মা সরোজ চৌধুরী আর নীলা সত্যিই এলেন বারিপদায়, আফিসে। খবর পেয়ে গেলাম আলাপ করতে। আমার ছেলে মেয়ে পত্নী রয়ে গেল সার্কিট হাউসে—খাবারদাবার খেয়ে তৈরি হয়ে থাকতে বললাম ফোন করে। ইতিমধ্যে আগের রাতে চৌধুরীকে যোগাযোগ করার চেষ্টা হয়েছে বিস্তর। যোগাযোগ করা যায়নি। টেলেকস মেসেজ পাঠাবার চেষ্টাতেও কোনো ফয়দা হয়নি। বরাতে ভর দিয়ে অপেক্ষা চলছিলো। ছুপুর বারোটা নাগাদ বারিপদার সাংবাদিক অমরেন্দ্র বসু খবর দিলেন—চৌধুরী সাহেব এসে গেছেন। না, এবারে আর খৈরীকে সঙ্গে করে আনেন নি। শহরের ছেলেমেয়ে পালে-পালে ওকে বিরক্ত করে। খৈরীর বিরক্তি তিনি না বাড়তে দেওয়ার সংকল্প করেছেন। এতে খৈরীর

মেজাজে চিড় ধরে। নানান কারণে এই অকারণ অসুবিধা তিনি হতে দিতে চান না। তাতে তার গবেষণার কাজে বাধা। বছর তিনেক আগেও তিনি বারিপদার ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার ছিলেন। '৭৩ সাল থেকে এই ব্যাঘ্রপ্রকল্পে। ছোটখাটো অমায়িক ভদ্রলোকটি মানুষের চেয়ে বাঘের ব্যাপারে বেশি চিন্তিত। আর খৈরী তো কন্যার বাড়া। অফিসে বসে কথা হচ্ছিল, আনন্দমেলায় খৈরীর ঠিকানা পেয়ে প্রতিদিন ছোটদের কাছ থেকে চিঠি আসছে যশীপুরের ঠিকানায়। খৈরীর মা প্রতিদিন গুনে গেঁথে রাখছেন বাণ্ডিল বেঁধে। আমি দু দিনের চিঠির তাড়া দেখছি। বেশ কিছু খুলেও পড়েছি। সুন্দর, ছোট্ট আকার আর আন্তরিকতায় ভরা সেসব চিঠির উত্তর দেবেন খৈরীর মানুষ-মা। কিন্তু, বাংলা তেমন রপ্ত নয় তাঁর। তবু দু-এক লাইন করে জবাব তিনি দেবেনই। খৈরীকে নিয়ে জঙ্গলে যাবেন ১১ মে। মাঝে মধ্যে যশীপুর আসতেই হবে। অন্তত দুটি মাস থাকার চেষ্টা করবেন। চাহালা, নোয়ানা এই দুটি বাংলোতে তো বটেই, কারিয়াকচাতেই হবে খৈরীর আসল শৈলাবাস। কোথায় থাকবে, তার খোঁজ মিলবে যশীপুরের অফিসে। সেখানে চিঠি লিখে জানতে হবে খৈরী কোথায় নেই আর কোথায় আছে।

কিছু চিঠিতে খৈরীকে রং-এর পেনসিলে আঁকা হয়েছে। কিছুতে লেখা হয়েছে তার নামে গদ্য-পদ্য। তাকে আদরসম্ভাসণ করে চিঠি এসেছে প্রচুর। দুর্গাপুর থেকে একটি শিশু লিখেছে, খৈরী হবে তার বড়দিদি। খৈরীকে আমার বোন! আমার নিজের কোন বোন নাই। যদি পরে বোন আসে, তখন কোনো চিঠিতে কলকাতায় নেমন্তন্ন জানানো হয়েছে। চিড়িয়াখানার বাঘবাঘীনিকে ভব্যতা ভালোমানুষি শেখাতে ডাকা হয়েছে আকুলভাবে। কোন্নগরের মিঠু স্বপ্ন দেখেছে, তার নিজের জন্যে আর প্রিয় খৈরীর জন্য বাবা দুটো ম্যাকসি কিনে এনেছেন। আর তারা দুজনে ওটা

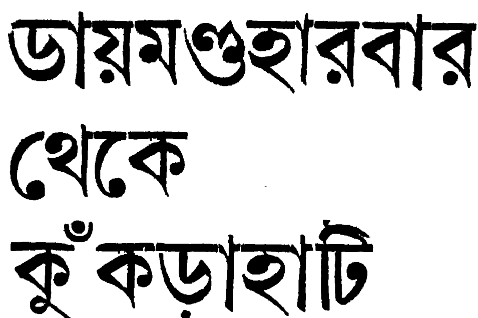
পরে নাচতে লেগেছে। নাচতে-নাচতে নাচতে-নাচতে তার সুখ স্বপ্ন টুটে গেছে। তখন কী কান্না ঐ মিঠুর, যে খৈরীর প্রানের বন্ধু। তাকে ছাখেনি। কিন্তু ছবি দেখেছে অজস্র। কোনো ছবিতে খৈরী উঠে গেছে, কোনোটিতে বাথটবে বসে স্নান সেরে নিচ্ছে। কোনটিতে শিশুর মতন বাথরুম করছে প্যানে। মার হাত থেকে আমূল গুঁড়ো চেটে নিচ্ছে। এই সব। এ ছাড়াও, অনেক, অজস্র।

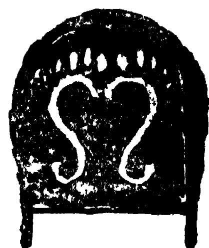
চৌধুরী সাহেব এই সব চিঠিগুলো থেকে বেছে একটি সুন্দর সারস্তে রিপোর্ট তৈরি করতে চান। না বেছে হলে আরো ভাল। এই বিপুল কাজটি এখনই শুরু না করলে পাহাড় হয়ে জমবে। পত্রলেখক-লেখিকার নাম-ঠিকানা—আর বিশেষ কী লিখেছে খৈরীকে কীভাবে সম্বোধন করেছে—এই সব থাকবে বিশদভাবে। পরে এই কাগজ থেকে দারুণ একটা কিছু বিশ্লেষণ বেরিয়ে আসবে, তার বিশ্বাস।

ওঁদের সঙ্গে কথা বলে আমি চলে এলাম সারকিট হাউসে। বললাম, ওঁরা আসবে তিনটে সাড়ে তিনটা নাগাদ। ওঁদের সঙ্গে আমরা চলে যাবো সোজা যশীপুরে—খৈরীর কাছে। যাঁদের গিয়ে খুঁজে নেবার কথা যশীপুর গিয়ে, সেই তাঁরাই এখানে উপস্থিত। দুয়ারে গাড়িও প্রস্তুত। সুতরাং চলো। ১০৪ কিলোমিটার পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ সামনে, সন্ধ্যের আগে পৌঁছুতে হবে যশীপুর, যা নাকি সিমলিপালের অন্যতম সুগম দরজা—পাহাড়ে ঢোকার, জঙ্গলে ঢোকার।

কাজের কাজ তাতে কিছু হচ্ছে কি ?

কিসসু না, কিসসু না।







ডায়মনডহারবার থেকে কুঁকড়াহাটি। পৌঁছুবার দশ মিনিট আগেই লনচ পিঠটান দিয়েছে। পরের লনচ দেড় ঘণ্টা বাদে। নৌকো ভরসা। পাল আছে। পিল পিল করে লোক ছুটেছে নৌকোর দিকে। আমরা একপা এগুই, তো দুপা পিছুই। কারণ আর কিছু নয়। হাওয়া জোর। ঢেউ থৈ থৈ। জোয়ারের জল তীরে নখ আঁচড়াচ্ছে। নৌকোর ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হয়ে না যায়। একটাই মুশকিল। ওদিকে কুঁকড়াহাটিতে জিপ অপেক্ষা করবে। বড়জোর তিনটে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত। পয়লা দৌড় হলদিয়া। জিপ ধরতে না পারলে নিজস্ব ব্যবস্থায় বাস। এইসব গাঁ গনজের সবজে বাসগুলোর চেহারা মনে পড়লেই বুক শুকিয়ে যায়। বাসের খোল থেকে, মাথা ভালো। মাথায় আলোবাতাস আছে, ঝাঁকাভরাট কুঁকরো-আছে, মণিহারি সওদার পাহাড়ে কাৎ হয়ে অনেকবার এখানে-ওখানে পৌঁছে গেছি। পথের ওপর হুমড়ি খেয়ে-পড়া ডালপালার বাড়ি খেয়েছি অনেক। আবার খেতে আপত্তি নেই। সুতরাং, নৌকো নৌকোই সই। ঘণ্টাখানেকে ওপারে পৌঁছে দেবে, মাঝির হলপ।

ঘাটে তিন পয়সা দিয়ে নৌকোয় পা। এই-ই নিয়ম। ঘাটের ইজারাদারের লোক দিনরাত দাঁড়িয়ে। ঘাটের ডাক বছরে সাতাশ হাজার টাকা। তিন তিনেক্কে যা হয় তা ইজারা-দারের। বাঁধানো-সারানোর দায়িত্ব ইজারা-দারের। সরকারের পকেটে সাতাশ। আট আনা মাথাপিছু নৌকোর। মোটঘাট পিছুও ঐ এক টিকিট। পঞ্চাশ পয়সা। মাঝারি চেহারার এরকম নৌকোর জন্য পঞ্চাশ যাবার কথা। উঠিয়েছে কন করেও একশ। মাঝি সদানন্দ খাড়ুই। বাড়ি কুঁকড়াহাটি। হালে বসে। দড়কচ্চা চেহারা। নুনহাওয়া খেয়ে চামড়া কালোকষ্টি। দাঁতের সারি কলিনস। হাসলে মাড়ি বেড়িয়ে পড়ে। বিশ বছর এই নদীতে। চাষের জমি সামান্য। এই নৌকো চাষই জাতব্যবসা। ছ' ভাই ছ নৌকো। ভাইপোরাও মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। তারাও নদীতে।

কথায় কথা বাড়ে। আমরা উড়নচণ্ডি ছইয়ের ভেতরে বসে তার বাক্যালাপ শুনতে শুনতে নদী পার হচ্ছি।

শুদ্ধু ঐ সাগরের কটা দিনি ইনিসপেকশন জবর। কোনো লৌকোই তিরিশের বেশি লোক তুলবেনি। তালেই ফাইন। সায়েবসুবো টই-টই ঘুরতেছে। অন্য সময় কখন ক্যামন তখন ত্যামন। এখন শুধু ডুবার আসা। লাভ তেমনি নেই। হাওয়া জোর উঠল, পালে বাতাস লাগিয়ে অন্তত বার পাঁচ ছয় পারাপার। সময় এসে গেছে। ফাগুন শেষ থেকে মাস তিন-চার যা কিছু রোজগার। জল হাওয়া ছুটোয় টান ভয়ংকর হবে তখন। না সদানন্দর নৌকো ডোবেনি কখনো। ডুবলেও ভয় নেই। নৌকো ভাসতে থাকে। খোলা ছড়ানো কাঠ ধরে কিছুক্ষণ ভাসো। তার মধ্যে মাঝিমাল্লারা উলটো নৌকো সুলটো করে তোমায় পুন'স্থাপিত করবে। সদানন্দ বললো, শুধু আপনেদের ঐ প্যাণ্টালুনটাই বিপদের! ওগুলো ভিজে এতোটা ভারি হয় যে সাঁতার কাটা শক্ত। আগে সদানন্দদের চল্লিশ পঞ্চাশটা নৌকো ছিলো। এখন

আটটা দশটায় দাঁড়িয়েছে। সবকটা নিয়েই এসোসিয়েশন। ন ভাগ আয় ধরলে, নৌকোর মালিক তিন, হালে যে বসবে তার তিন ভাগ, আর তিনজন দাঁড়ির এক-এক করে তিন। কিছু নৌকা ভাড়ায় খাটছে। তাতে লাভ বেশি। পোরট কমিশনারস নিয়েছ কটা। বাকিগুলো মাছ কোমপানি ভাড়া নিয়েছে।

জিগ্যেস করি, এ ধরনের নৌকোর দাম কেমন ?

এখন হাজার পাঁচ ছ হবেন। আগে হলি তিনের বেশি হতোনি। এছাড়া ফি-বছর হাজার টাকা কাঠকুট সারাতে, অং করতে, ঘুষঘাষ দিতে। লাইসেন আছে। ২৪ পরগণার লাইসেন দিলিও রক্ষেনি। মেদিনীপুরের তীরে ভিড়লি, আলাদা লাইসেন দিতে হয়। যাতি-আস্তি টেকা। লনচ হয়ে নৌকো মার খাচ্ছে, একথা ঠিকই। নৌকো ছাড়া এদিককার মানুষের কোনো উপায় নেই। লনচ তো সেদিনের পোলা। আও সবদিকে তো আর স্থায়ী সারভিস নেই। নৌকোই সম্বল। ভোটের কথা তুললুম। সদানন্দর হেসে জবাব, দোবো। কাকে দোবো ? আপনে বলেন। আকি কী বলবো ? সে তো তামার ব্যাপার। তাহলি ? দেওয়া যাবেখেন। যারে ইচ্ছি দোবো। এখন কী ?

রিজারভ ব্যাংকের ক্লাস ফোর স্টাফ জনৈক সহযাত্রী। নৌকোয় তিরিশ বছর ধরে আসা-যাওয়া। আর কটা দিন পার করতে পারলেই সব চুকেবুকে যায়। শনিতে ফেরেন সুতাহাটা। রবির বিকেলে কলকাতা। এমারজেনসির আগে সোমবার গাঁ থেকে বেরুতেন। তাতে দেরি হয়। দশটা পাঁচে নামের পাশে ঢেরা পড়ে, দশটা পনেরোয় 'এ'। তাই সাবধান হতে হয়েছে। চারজ-শিটও আছে। চাকরি নট হওয়া আছে। এমন নজির বেশ কয়েকটা।

কুঁকড়াহাটির ভাঙা কাদামাখা ঘাট ছ পয়সা চেয়ে নিল। এখানে এখানে ইজারা, মনে হয়, সামান্য রোগাই। এক ঘণ্টার জায়গায়

ঘণ্টা দেড়েক লাগানো। হাওয়া পড়ে গিয়েছিল হঠাৎ। কারণটা তাই। ভাগ্যক্রমে মিনিবাস। আশি পয়সায়, বিশ মিনিটে, হলদিয়ার সিংদরজা দুর্গাচকে। লোক থই থই বাজার অঞ্চল সেটা। জিপ এবং জিপের মালিক খুঁজতে সেখানে নেমে পড়লাম। বাজারের মধ্যে দিয়ে হাঁটা। দুপাশে সবজির পাহাড়। এমনকি নিমপাতার বাণ্ডিল সজনেফুলের নৈবেদ্য, ডঁইকর কেঠো শিম টুকটুকে বিলিতি বেগুন।

হাতে একটু সময় আছে। জিপ আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে আরো দু এক ঘাটে। যদি অন্যদিকে পার হয়ে থাকি। আমরা বাজারের ভিড়ে গা ভাসিয়ে দিলাম। কাঁচা সবজি দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। ছটফটে মাছচিংড়ি। চালকলা।

বাজারে ভদ্রমহিলার সংখ্যা বেশী। বাজার না হাট? শনিবারের বিকেলের হাট। জমজমাট। মুরগি আর মুরগির ডিমের টিলে এখানে-ওখানে। নিজেই থলি হাতে বা পিছনে চাকর হাট সেলাই করছেন নানাদেশি মহিলার দল। সায়েব-মেমও নজরে পড়ে। সবাই হলদিয়ার কাজে যুক্ত। মূল কর্মকাণ্ড থেকে মাইল কয়েক দূরে আছে। এখন হলদিয়া আলাদা মহকুমা। থানা একটা দুর্গাচকে, অন্যটা বাঘনাপাড়া। হলদি নদীর জন্যেই হলদিয়া।

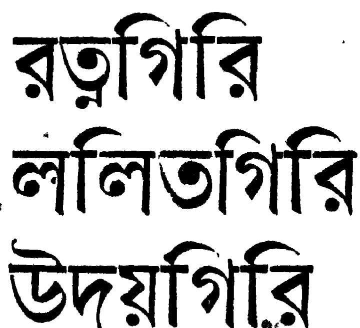
বাজারের কাদামাটির দেওয়াল ঘেরা চা দোকানে। ঘুগনি আর চা খাই। দু এক কথায় জানতে চাই, ভোটের হাওয়া। কিছু নেই। সামানে অ্যামবাসাডর থেকে লটারির টিকিট কেনার ঢালাও নেমতন্ন মাইকে। এক বিন্দু চিন্তির চারদিকে পিঁপড়ের মতন মানুষ।

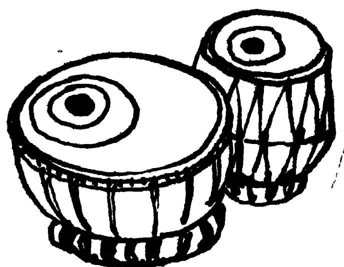
হলদিয়া চক্কর দিলাম জিপে। তেল জেটিতে কিছুক্ষণ। জেটির বাইরে অন্ধকার হুগলি নদী। কিছু ঠাহর করা যায় না। জোছনা রাত হলে ভালো হত। ইনডিয়ান অয়েল শোধনাগার থেকে পাইপে জল পড়ছে নদীতে। টিট-করা জল। তবুও গন্ধ যায় না।

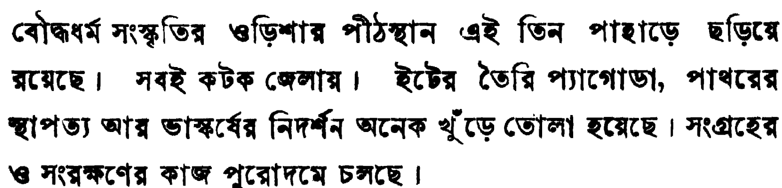
ন্যাপথাল গন্ধ বাতাসে। কথায় কথায় কে যেন বললেন, ইলিশ এ গন্ধ সহ্য করতে পারছে না। সরে যাচ্ছে। বছর দুই তাই ইলিশ নেই। আগে খুব পড়তো।

কিছুক্ষণ ঘুরে-ঘারে আমরা সি পি টি বাংলোয়, অতিথিশালার ঘরে। সুন্দর ঘর। বিছানাপত্তর সব আছে। মশা থিকথিকে. এই নতুন উপনিবেশ। মশারি আছে। নিচে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও খুব ভালো। দিনে দশ টাকা। খাওয়া আলাদা। মোটেল হয়েছে। মোটেল দিনে একটু বেশি। খাওয়া আলাদা। সেখানে খরচ অনেক বেশি। কলকাতা থেকে দু দুটো বাস যাচ্ছে আসছে। হাইওয়ে এখনো খোলেনি। এটা খুললে হলদিয়া কলকাতার খুব কাছে এসে যাবে। জিনিস পত্রের দাম এখন কলকাতার তুলনায় বেশি। শুধু চাল ছাড়া। চাল শস্তাই। দু টাকা বিশে ভালো চাল। উপনিবেশ তিলতিল করে গড়ে উঠছে। দশ বছরে হলদিয়া তিলোত্তমার রূপ পাবে। মাটির সিনেমা হল আছে। ইস্কুল পাঠশাল সাধারণের জন্যে তেমন নেই। সাংস্কৃতিক জীবন নেই। খেলাধুলোর মাঠ নেই। সব হবে। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বেশ ভালো। চুরি-পিঁচুটির দু একটা ঘটনা থাকলেও খুনের খবর নেই। ডাকাতি নেই। যাত্রায় ভিড় দশহাজারী। সব নামকরা পালা এখানে হয়ে গেছে। হলদিয়ার আসল মাটির মানুষ আজ ভিখিরি। আগন্তুকের হাতে পয়সা আছে।

রাত কাটিয়ে হলদিয়া ছেড়ে সকালে আবার পথে বেরুলাম। সময় নেই। আরো দু-একটা গ্রাম-গনজ ঘুরে শহরে ফিরতে হবে। মহিষাদল থেকে বাঁদিকে মোড় নিলাম। যাবো মীরপুর—এককালের পতু গীজ বসতি, যাবো গেঁওখালি ডাকবাংলোয়। সেখান থেকে নদী পার হয়ে নুরপুর—হুগলী পয়েনট।







বৌদ্ধধর্ম সংস্কৃতির ওড়িশার পীঠস্থান এই তিন পাহাড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। সবই কটক জেলায়। ইটের তৈরি প্যাগোডা, পাথরের স্থাপত্য আর ভাস্কর্যের নিদর্শন অনেক খুঁড়ে তোলা হয়েছে। সংগ্রহের ও সংরক্ষণের কাজ পুরোদমে চলছে।

এই তিন পাহাড় জুড়ে এককালে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো। নালন্দা থেকে হিউ এন সাং এখানে যোগ অধ্যয়ন করতে এসেছিলেন, ৭ম শতাব্দীতে। রাজা শুভঙ্কর তাঁর হাত দিয়ে ৭৯৫ খৃঃ-এ চীনসম্রাট তে-সোং-এর কাছে 'অবতংসক'-এর একটি কপি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ছিলো 'পুষ্পগিরি'। নালন্দার পরেই এই পুষ্পগিরির খ্যাতি।

কী দেখবেন ?

ললিতগিরি—পাহাড়ের মাথায় নানান ধরনের ধ্বংসাবশেষ। ইটের একটি টিলা খুঁড়ে প্রচুর বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। চূড়াতেই একটা অস্থায়ী শেড বানিয়ে সেগুলি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। গাড়ি করে পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত যাবার রাস্তা আছে।

উদয়গিরি—সারা পাহাড়টা ছড়িয়ে আছে ভাঙা চোরা মূর্তি, আর খণ্ড খণ্ড খিলান, প্রাচীর আর স্থাপত্যের নিদর্শন। 'লোকেশ্বর'

মূর্তিটি ৮ফুট দীর্ঘ। পাদদেশে ৮ম শতাব্দীর সময়কালের কিছু অনুশাসন লিপিবদ্ধ। ১০ম শতাব্দীতে পাহাড় কেটে একটি ইঁদারা বানানো হয়েছিল। সেটাও দেখার।

রত্নগিরি—এটি ললিতগিরি উদয়গিরির তুলনায় অনেক বড়। খোঁড়ার ফলে স্তূপ স্তম্ভ মূর্তি ছেড়ে দিলেও, দুটি বিরাট প্রার্থনা সভাগৃহ উদ্ঘাটিত হয়েছে। বেশির ভাগ সেই পাতলা ইটে গাঁথা। বিশাল দরজা, দীর্ঘকায় বুদ্ধমূর্তি ভারতীয় শিল্পজগতের এক অত্যাশ্চর্য নিদর্শন। গুপ্তযুগের পরে এতো বেশি বৌদ্ধভাস্কর্য আর স্থাপত্যের নিদর্শন আর কোথাও পাওয়া যায়নি। নালন্দা যাঁরা গেছেন, তাঁদের অবশ্যই একবার এই জায়গা ঘুরে যেতে অনুরোধ করবো।

থাকার জায়গা বলতে (১) বালিচন্দ্রপুর ডাকবাংলো (২টি স্যুইট) একসপ্রেস হাইওয়ের পাশেই। (২) গোপালপুর। একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার, মহানদী ডিভিশন (উত্তর), জগতপুর, কটক। ফোন ২৯৩৪৪। খানসামা বালিচন্দ্রপুরে আছে। গোপালপুরে নেই।

কটক রেলস্টেশনে নামাই সুবিধা। ভুবনেশ্বর থেকে রত্নগিরির দূরত্ব ১০৫ কিলোমিটার। মোটর ১০০ কিমি পর্যন্ত যাবে। বাকি পথটা হাঁটতে হবে। বেণীপুরে বিরূপা নদী পার হতে হবে। ললিতগিরি ভুবনেশ্বর থেকে ৯০, উদয়গিরি ৯৫ কিমি। ভালো রাস্তা দুটোরই। গাড়ি নিয়ে অনায়াসে পৌঁছুনো যাবে। মনিয়াবান্ধা আর নুয়াপাটনায় এখনো দুটি বৌদ্ধ গ্রাম আছে। তাঁতের কাজ করে। ভুবনেশ্বর থেকে আটগড় লাইনে ভায়া চৌদোয়ার ঐ দুটি লাইনে পৌঁছুনো যেতে পারে। খুব সুন্দর শৌখিন তাঁতের কাজ। ললিতগিরিতে ভাস্করদের একটি গ্রাম আছে। যারা উত্তরাধিকারসূত্রে পাথরের মূর্তি খোদাই করে। নিখুঁত সেই কাজ। কেউ ইচ্ছা করলে অমন পাথরের দু একটি মূর্তি স্মৃতিচিহ্ন হিসেবেও কিনে নিয়ে আসতে পারেন। নিখুঁত শিল্প কর্ম। দামও বেশি না

রাণীপুর ঝরিয়াল

বলাঙ্গীর জেলার টিটিলাগড় মহকুমার ছুটি গ্রাম রাণীপুর-ঝরিয়াল। টিটিলাগড় থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরত্ব। সড়কপথে বছরের সমস্ত সময়েই যাবার সুন্দর রাস্তা।

তীর্থযাত্রীদের কাছে 'সোমতীর্থ' নামে বিখ্যাত। কতো যে মন্দির তার হিসেব নেই। অনুমান ৮ম থেকে দশম খৃষ্টাব্দের মধ্যে এগুলি নির্মিত হয়েছিল। মন্দির আর স্তম্ভ দেখে এখানে শৈব, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ধর্ম এবং তান্ত্রিকতার পরিচয় মেলে।

ওড়িশায় সাংস্কৃতিক পর্যটন যদি কেউ করেন, তাঁর জন্যে রাণীপুর-ঝরিয়াল সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হবে।

নানান আকারের প্রায় ৪০টি মন্দির। সবচেয়ে বড়ো মন্দির সোমেশ্বরের। পাথর কেটে এই সমস্ত মন্দির তৈরী করা হয়েছে। সোমেশ্বর মন্দির মত্তময়ূর শৈবরীতির প্রবক্তা শৈবাচার্য গগনশিব তৈরি করিয়েছিলেন বলে প্রসিদ্ধি। তাঁর অনুশাসন মন্দিরের লিনটেলে খোদিত আছে আজো।

একটি মন্দিরে তিন মুখ বিশিষ্ট শিব, পার্বতীকে আলিঙ্গন করছেন। দেয়ালে চৌষট্টি যোগিনী মূর্তি। এই যোগিনী মন্দির ভারতের চারটি বিশ্বখ্যাত মন্দিরের অন্যতম। বাকি তিনটি হলো খাজুরাহো, ভেদঘাট (জববলপুরের কাছে) আর ভুবনেশ্বরের কাছে হীরাপুরে।

ওড়িশায় ইটের তৈরি মন্দির যা এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে এখানের বিষ্ণু-মন্দির তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। ৬৫ ফুট উঁচু। ভারতের ইটের তৈরি দীর্ঘতম মন্দিরগুলির মধ্যে এটি একটি।

আরেকটি মন্দিরে বুদ্ধদেবের ধম্মমুদ্রায় উপবিষ্ট মূর্তি।

এখানে ঢুকতে কোনো পয়সা কড়ি লাগে না। বিদেশীরাও ঢুকতে পারেন। কোনো বাধা-নিষেধ নেই। এই মন্দির ও মূর্তিগুলির সংরক্ষণের কাজে রাজ্যপুরাতত্ত্ব বিভাগ হাত দিয়েছে। কাজ পুরোদমে চলছে।

রেলহেড্ টিটিলাগড় কিংবা কাঁটাবনজি। দক্ষিণপূর্ব রেলপথে পড়বে। টিটিলাগড় থেকে ট্যাক্সি মিনিবাস পাওয়া যাবে।

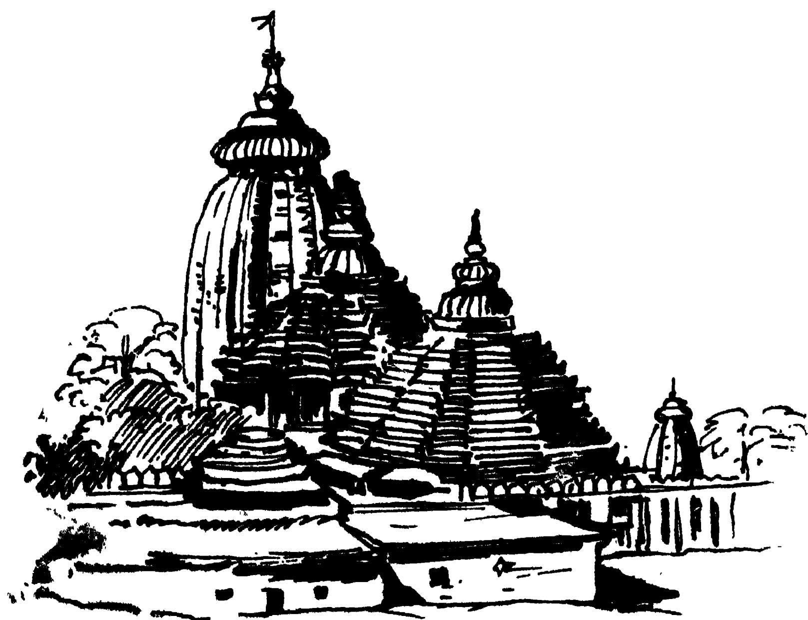
থাকবেন কোথায় ?

(১) বোঙ্গামুনডা রেভিনিউ রেস্ট হাউস। ১ স্যুইট। রিজারভেশন বিডিও—বোঙ্গামুণ্ডা, ১১ কিমি দূরে

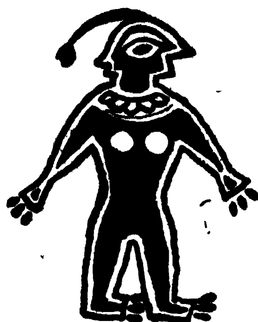
(২) সিনধেকেলা রেভিনিউ রেস্ট শেড। ১ স্যুইট। রিজারভেশন : বিডিও—সিনধেকেলা, ৮ কিমি দূরে

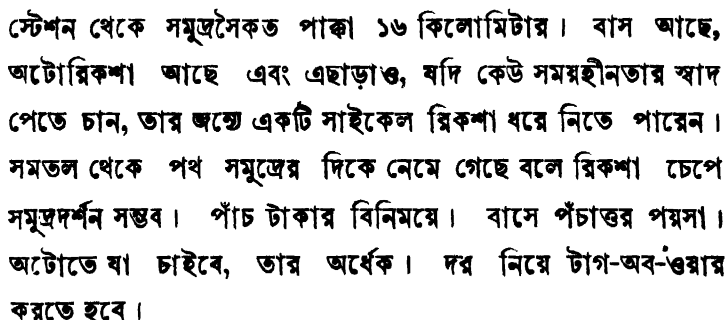
(৩) পি ডবলু ইনসপেকশন বাংলো, টিটিলাগড়। ৪ স্যুইট। রিজারভেশন : একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার, বলাঙ্গীর, ২৯ কিমি দূরে।

(৪) পি ডবলু ইনসপেকশন বাংলো, কাঁটাবনজি। ২ স্যুইট রিজারভেশন ইনজিনিয়ার কাঁটবনজি ২৯ কিমি দূরে, আলো আছে।









স্টেশন থেকে সমুদ্রসৈকত পাক্কা ১৬ কিলোমিটার। বাস আছে, অটোরিকশা আছে এবং এছাড়াও, যদি কেউ সময়হীনতার স্বাদ পেতে চান, তার জন্যে একটি সাইকেল রিকশা ধরে নিতে পারেন। সমতল থেকে পথ সমুদ্রের দিকে নেমে গেছে বলে রিকশা চেপে সমুদ্রদর্শন সম্ভব। পাঁচ টাকার বিনিময়ে। বাসে পঁচাত্তর পয়সা। অটোতে যা চাইবে, তার অর্ধেক। দর নিয়ে টাগ-অব-ওয়ার করতে হবে।

স্টেশনের নাম বালেশ্বর, ইংরিজিতে বালাশোর। কলকাতার খুব কাছে। দীঘায় পৌঁছুতে যতটা সময় এখন লাগে তার চেয়ে যৎসামান্য বেশি। ভাড়াও প্রায় সমান সমান। একপিঠ তেরো টাকায় পৌঁছুনো যাবে চাঁদিপুর-অন-সী। এমন নির্জন সৈকতাবাস ভারতবর্ষে আর আছে বলে জানি না। নির্জন এবং ভয়ংকর সুন্দর। বালি আর ঘনভুরুর মতন কাজলটানা ঝাউ। মাঝে মধ্যে কাজুবাদাম গাছ। সরকারি দোতলা ট্যুরিস্ট লজ ছাড়াও আছে সমুদ্রের উপর হুমড়ি-খেয়ে-পড়া ক্যাসুরিনা হাউস—

বনবিভাগের কুঠি। আগে ছিল ময়ুরভঞ্জ রাজার সৈকতাবাস। এখন সরকারের। এছাড়াও সমুদ্রের কোলে পি ডবলু ইনসপেকশন বাংলো। বেসরকারি বিলাসবহুল খাওয়া-থাকার ব্যবস্থাসহ শান্তিনিবাস, দারোয়ান রাঁধুনি আছে। নিজেরা রেঁধে-বেড়ে খেতে চাইলে তার জন্যেও হাঁড়িকুড়ি থালাবাসন সব পাবেন। বিছানামাদুর কিচ্ছু নিতে হবে না। পকেটে গোটা পঞ্চাশেক টাকা নিয়ে একবস্ত্রে সমুদ্রতীরে গিয়ে দাঁড়ান। একটা দুটো দিন স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে।

খরচাপাতি সম্পর্কে আরো দু-চারটে কেজো খবর দিয়ে একেবারে সমুদ্রে ঝাঁপ দেবো।

টুরিস্ট লজে খাওয়ার ভাল ব্যবস্থা আছে। মিঠে জলের মাছের সঙ্গে সরু চালের ভাত। নোনা মাছ ভাজা। মুরগির ভীষণ দাম। মাংস ডিম বললেই ব্যবস্থা। নিরামিষ খান্নার হাত চলনসই। জলে খনিজ-সম্পদ আছে। সুপাচ্য বাতাস। লজের ভাড়া ১৬-১৮। উপর নিচ। কি-ঘরে দুজনের দুটি খাট। ডানলোপিলোর গদি। পৌঁছেই পাওয়া সম্ভব। তবু আগে থেকে বন্দোবস্ত করতে হলে টুরিস্ট অফিস বালাশোরে লিখুন। ফোন নম্বর বালাশোর ৪৮। লজের ফোন বালাশোর ১৫১। ম্যানেজার মজুত। ক্যাসুরিনা হাউসের জন্যে ডি এফ ও, বারিপদাকে লিখতে হবে। একটি স্যুইট পাবেন। আরেকটি বিভাগীয় সংরক্ষণে। পি ডবলু বাংলোর জন্যে একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার বালাশোর। ক্যাসুরিনা-কুঠিতে একঘরে দুটি খাট। ড্রয়িং ডাইনিং সব আছে। ঘর প্রতি ১২ টাকা দিনে। পি ডবলু ৩-৫০। বালেশ্বর পৌঁছুতে ট্রেন রাতেই বেশি। পুরী এক্সপ্রেস, পুরী প্যাসেনজার, মাদ্রাজ-জনতা। দিনে ইসটকোসট, যেটার আগের নাম হায়দরাবাদ এক্সপ্রেস। তবে সবচেয়ে সুবিধে, ধর্মতলার গুমটি থেকে বাসে চেপে বসা। সকালের পুরীর বাস বালেশ্বরে দুপুর একটার মধ্যে নামিয়ে দেবে। সেখান

থেকে সমুদ্র ১৩ কিলোমিটার। বালেশ্বরে দুপুরের খাবার সেরে নিশ্চিন্তে সমুদ্রতীরে।

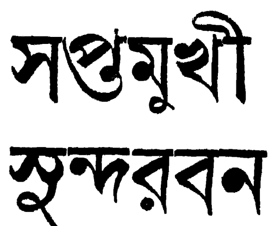
লিপো চাঁদ দেখে জলে ডুবে মরেছিলেন। কবি লিপো। আর চাঁদিপুরের চাঁদ সমুদ্রজলে ঝিকিমিকি মোহর ছড়িয়ে রেখেছে। তাই কুড়োতে ঝাঁপ। এক হাঁটু জল। ভয়-ভাবনাহীন তরঙ্গভঙ্গ। সমুদ্রের বুকে হেঁটে চার পাঁচ মাইল চলে যাওয়া গভীরে ভাঁটার সময়। জোয়ারে জল সৈকতাবাসের কোলের কাছে চলে আসবে। উপবিষ্ট স্নান সম্ভব, অবগাহন নয়। শক্ত চ্যাটালো সমুদ্র বেলাভূমি। বালি ওড়েনা বাতাসে। তার উপর আছে এক ধরনের ঘুনখাকী লতা—যা বালিভূমিকে আষ্টেপৃষ্টে শিকড়ে বাঁধে। চাঁদিপুরের সমুদ্র দীঘার মত হাঁ করে নেই। মাটির ক্ষয় নেই এখানে। মাইল মাইল ধূলো-বালি আর ঝাউবন। তটভূমি-ছড়ানো ঝিনুক, শামুক আর ক্ষয়া-খর্বুটে শিকড়-বাকড়। দূরে থেকে দেখলে কেউ সাপ, কেউ বসন-কুকুর, কেউ কুমির ছানা। কুড়িয়ে বাড়ি এনে, ছেঁটে কেটে রং চড়িয়ে কাটুম-কুটুম শিল্প। একহাঁটু সমুদ্র জল থেকে সমুদ্রের লতাগুল্ম, সমুদ্রঘোটক, জেলিজাতীয় হরেক রকম প্রাণী, রঙিন মাছ-ব্যাঙ প্লাসটিকের ব্যাগে পুরে সোজা বাড়ি। এ্যাকোরিয়মে।

একটা চমকদার আওয়াজ শোনা যাবে প্রতি মুহূর্তে। গোলার আওয়াজ। গোলাবারুদ পরীক্ষা-কেন্দ্র হলো পাশেই। সমুদ্রে দূরে অনেকগুলি লক্ষ্যবস্তু। সেই লক্ষ্যে গুলি ছোটে। এক সময় সেই ফাঁকা শেল কুড়িয়ে আনা।

ক্যাসুরিনা হাউস থেকে মাইল দেড়েক তীর ধরে গেলে বড়া বড়ঙ্গ বা বুড়ি বালামের মোহনা। নদী যেখানে সমুদ্রে পড়ছে, সেই মোহনা-মুখ থেকেই 'ফিসিং ভিলেজের' শুরু। সারবন্দী মেছো নৌকা পাঁচ ছ'শ। মাছ মারিয়েদের বেশির ভাগ বঙ্গদেশীয়। মেদিনীপুর, হুগলী, নদীয়া, ২৪ পরগণা থেকে ওরা আসে। তিন

মাস থাকে। তিন মাসী ঘরগেরস্থালি—সবই নৌকার ওপর। মাঘের মাঝামাঝি এদের পাততাড়ি গুটোতে হবে। নোনা হাওয়া বইবে জোর। এতো নুন, চিমটি কাটলে গা থেকে নুন উঠে আসে, নুনের সঙ্গে চামড়া। তীর ঘেঁষে ঝোপড়ি আছে একটানা। খোড়ো চাল। এক হাত দরজা। গুঁড়ি মেরে ঢুকতে হয়। ঘরের চাল মাটিকে প্রণাম করছে যেন, এমন ঢালু যাতে বাতাস ধাক্কা মেরে খুলি ওড়াতে না পারে। জায়গাটার নাম বলরামগুড়ি। যেখান থেকে নৌকায় ওপারের কাছে-দূরের গাঁয়ে মানুষ যায়-আসে। ভটভটিয়ে চলছে মোটর বোট। শুক্নু মাছ ধরার জন্যে। ইলিশই প্রধান শস্য। ছোট বড়ো ভোলা চাঁই বাঁশপাতি, রুপোপাতি ফ্যাঁসা, কুঁজো ভেটকি, ম্যাকরেল। দিনে দশ-বার টন চালান যায় কলকাতায়। এছাড়া চিলকার মিষ্টি মাছও যায় শহরে দৈনিক। আড় ট্যাংরার মতন এক জাতের মাছ ছু-চালা করে রোদ্দুরে পাতা। বনমালি মাঝি বললো, আধশুকনো এর দাম দেড় টাকা কেজি পুরো শুকোলে ষোল টাকা। শ্রীরামপুরে আস্তানা, হালসাকিন এসেছে চাটগাঁ থেকে। ককশোবাজারে নীল জলে মাছ ধরেছে। বয়স ষাট।

ছোট সাগরের মেলা বসে পৌষ সংক্রান্তি থেকে। স্নানমেলা। বলরামগুড়ির হাটের নীচে ভাগাড় ময়দানে মেলা বসে। বিকি-কিনির হাট। যাদুশিবির, নরককুণ্ড, নাগরদোলা। দূরে বাঁশের দণ্ডে পত পত করে উড়ন্ত নিশান। তার নিচে মাদল বাজছে। তালে তালে চলছে একধরনের মিশ্র নাচ। সাঁওতাল নাচের যে ধীর রগড় তা এখানে নেই। বিলাসপুরী নাচের সঙ্গে মিলেমিশে এ একরকম গা-ঝাঁকানো নাচ-রঙ্গ। সমুদ্র-ঢেউএর সঙ্গে মিল আছে কিছুটা। জলের আবোলতাবোল শব্দের সঙ্গে। আর কিছু নয়। এ নাচে পাহাড়ের শাল সেগুনের ছায়া নেই।





সপ্তমুখী নদীর নাম। সাতটা যার মুখ। সাত সাতটা আঙুলে পুরো সুন্দরবন অঞ্চলটাকে কাঁকড়ার মতন আঁকড়ে ধরেছে। জঙ্গলের আর নিস্তার নেই। দাড়ার কামড় সইতে না পেরে ছটফটিয়ে উঠছে সুন্দরী জঙ্গল। থেকে থেকেই।

কথা ছিল, নামখানা পর্যন্ত বাসে যাবো। তারপর লনচ। আমরা কলকাতা-নামখানা বাসে সেভাবেই টিকিট কেটেছিলাম। কিন্তু মাঝপথে পাকড়াও। কাকদ্বীপে ধরা পড়লুম। সেখান থেকে জিপে নামখানা।

নদীর প্রায় ধারেই বাংলো। বিরাট চৌহদ্দি। জেলখানার মতন উঁচু পাঁচিলে ঘেরা বাংলো মাঠ, মিঠে পানির পুকুর, গাছপালা। সাগরমেলায় যাবার দিন ওই বাংলোয় ঢুকেছিলাম। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার। থাকিনি।

হাতানিয়ায় সেচ বিভাগের লনচ দাঁড়িয়ে। এ-তল্লাটের বিভাগীয় কর্তাও যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে। কিংবা, বলা ভালো, আমরাই তাঁর পিছু নিয়েছি। তিনি যাচ্ছেন কাজে, আমরা অকাজে।

এ-অঞ্চলের নদীনালা বন-জঙ্গলের কথা শুধু কানেই শুনে এসেছি এতকাল। চোখে দেখা এই প্রথম। লনচ গিয়ে প্রথম নোঙর ফেলল সীতারামপুর ঘাটে। লনচেই থেকে গেলাম রাতটা। সারেঙ-এর ওয়াচ-টাওয়ারের পিছনে, একটা সুন্দর ছোট্ট ঘরে। পায়ে না হেঁটে হাঁটুতে হাঁটা। ঐটুকুই যা নতুন। খাট বিছানা সব আছে। আলো পাখা। আমি কিছু বইনি। নিজেকেই বইছি। লনচে তোয়ালে সাবান সব মজুত।

সীতারামপুর লনচঘাটা বাঁধানো। নদী থেকে উঠলেই বাঁধ। বাঁধের ঠিক নিচে কাঁটাতারের বেড়াঘেরা দুঘরা ডাক-বাংলো। সেচ বিভাগের রেসটশেড। বিজলী নেই। জোলো নোনা হাওয়া উঠেই আছে। চামড়ার ওপর নুন জমছে।

সকালের নাস্তা আমরা বাংলোতেই সেরে নিলাম। নিয়েই দুচার-কদম ঘুরপাক খেয়ে গেলুম বিশালাক্ষীতলা। পাথরের ওপর সোনার পাতের চোখ নাক মুখ বসানো। পাকা বাড়ির মন্দির। সীতারামপুরে বোধকরি পাকাবাড়ি ওই দুটোই। একটা বাংলো অন্যটা ওই বিশালাক্ষী মন্দির।

বিশালাক্ষী মন্দির ছেড়ে আলপথ। আলের দুধারে ন্যাড়া জমি। ওপরে নুনের সর। ছিয়াত্তরের নয় দশ সেপ্টেম্বর যে ভয়াবহ সাইক্লোন হয়েছিল, দক্ষিণবাংলার এ-অঞ্চলের অর্থনীতিকে তা গোড়া থেকে কোপ মেরেছে। এই নুনের সর মুছতে একটা বর্ষা লাগবে। জান কেটে বৃষ্টির জল জমিয়ে বের করে দিতে হবে। মোট কথা জমি বহুবার ধুতে মুছতে হবে। চুনকাম শেষ ঘরের মেঝে ধোয়া-পাকলা করার মতন, যত্নে। আমরা হাতানিয়া-দুয়ানিয়া, বরচড়া, সপ্তমুখী, ওয়ালস ক্রীক, কারজন ক্রীক, চালতাবুনিয়া জগদ্দল পর্যন্ত গিয়ে ফিরেছি। ঠাকুরাইনে লনচ ঢুকতে পারেনি। ঢুকতে গিয়ে মোচার খোলার মতন লনচ উলটে-পালটে যাচ্ছিল।

সারেঙ ধীরেন। বিশ পঁচিশ বছর এই অঞ্চলে। লনচটা

আদপেই সেচ বিভাগের নয়। ভাড়া করা। দিনে একশ চুরাশি টাকা। তারপর ডিজেল আলাদা। ধীরেনের সঙ্গে আছে জনা দুই। এরা সবাই মালিকের মাইনেতে। লনচ বসে থাকলেও ভাড়া লাগছে। যা লাগছে না, তা হল ডিজেল।

সীতারামপুর পাথর ব্লকেই। পাথর-প্রতিমা ব্লকে পড়ছে। দক্ষিণ শিবগনজ, লক্ষীনারায়ণপুর, কিশোরীনগর, বরদাপুর, উত্তর সুরেন্দ্রগনজ, দক্ষিণ সুরেন্দ্রগনজ ভাগবতপুর মাধবনগর দুর্বাচটি, গদামথুরা, বনশ্যামনগর ব্রজবল্লভপুর ক্ষেত্রমোহনপুর গোবিন্দপুর আবাদ, কৃষ্ণদাসপুর সত্যদাসপুর। পাথরপ্রতিমা জেটি যে নদীতে, সে-নদীর নাম গোবদিয়া। এদিকে কলেজ বলতে কাকদ্বীপ আর ডায়মনড-হারবার। হাইস্কুল বিস্তর। মেয়েদের স্কুল অনেক। ইনসপেকটর অব স্কুলস আমাদের সহযাত্রী। কথায় কথায় তিনি বললেন, পাথরের লেখাপড়া জানা মানুষের সংখ্যা শতকরা ৫৫ জন, কাকদ্বীপে শতকরা ৬০, সাগরে শতকরা ৬৫ জন। নামখানা জেটিঘাটে পৌঁছুতে সামনেই একটা বড়ো হলুদ ভুঁয়ে কালো হরফে লেখা : ভাগবতপুর কুমীর প্রকল্প—হ্যাচারি এবং রিয়ারিং প্লানট।

ভাগবতপুরের কুমীর প্রকল্পের বয়েস বছরখানেকও নয়। সেখানে সুন্দরবনের নানান চর আর দ্বীপ ঘুরে ৪২টি কুমীরের ডিম জোগাড় করা হয়েছিল প্রথম দফায়। পরীক্ষামূলকভাবে সেই ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বের করা হয়েছে। দুটি ডিম নষ্ট, একটি বাচ্চা—হয়েই মারা গেছে। বাকি ৩৯টি বাচ্চা কুমীর নানা আকারের চৌবাচ্চায় রাখা হয়েছে। বেশিরভাগই মেছোকুমীর। আকারে ছোট। সব চৌবাচ্চাগুলোই একটা জালে ঘেরা হলঘরে রাখা। এভাবে ডিম থেকে বেরিয়ে আসা কুমীর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে আসবে ভবিষ্যতে। পশ্চিম বাংলায় এমন প্রকল্প এই প্রথম। ওড়িশায় বছর দু তিন আগে এ ধরনের একটি প্রকল্প চালু হয়েছে, বলে শুনেছি।

সেখা থেকেই ইচ্ছে, আর কোথাও না যাই, ভাগবতপুর ঘুরে আসতেই হবে। জঙ্গলে ঢুকতে ছাড়পত্র লাগে। তা আমাদের সঙ্গে নেই। বনবিভাগের লোকজন সঙ্গে না থাকলে এমন কোন্ অবিমৃষ্যকারী আছে, যে সুন্দরবনের এদিককার ডাকসাইটে জঙ্গল বিজিয়ারি, ধনচে বা লুথিয়ানে নামতে সাহস করবে? আমরা দূর থেকে লুথিয়ানের নীলাঞ্জন ছায়া দেখে এবারের মতো সন্তুষ্ট। বিজিয়ারি জঙ্গলের পাশ দিয়ে মাইলের পর মাইল জল কেটে যেতে পেরেই সুখী।

সুন্দরবনের জঙ্গলের চেহারা চরিত্তিরই আলাদা। এতোকাল তো শাল সেগুন মহুয়ার জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছি। একে তাই ঠিক জঙ্গলের নামে ডাকতে বাধো-বাধো ঠেকলো প্রথমেই। জঙ্গল না বলে বাইনের ঝোপ বলাই ভালো। নদীর দুপাশের এই দ্বীপগুলোর কাছে দূরে মানুষের বসতি আছে। অনেকগুলোয় নেই। অধিকাংশের জীবিকা মাছ ধরা, মধু সংগ্রহ। চাষ-বাস খুব সামান্যই। তরমুজ হয়। আলু সামান্য কিছু হয়। কাজু বাদামের চাষের জন্যে অত্যন্ত উপযুক্ত জমি। ব্যাপকভাবে কাজুর চাষ হলে এ-অঞ্চলের ভাগ্য দুবছরের মধ্যে ফিরে যেতে পারে।

চাঁদসদাগরের হাতে হেঁতালের লাঠির কথা কে না জানে? কিন্তু হেঁতাল গাছ দেখে তার মধ্যে উপযুক্ত লাঠি খুঁজে পাইনি। বেঁটে খেজুরগাছের মতন চেহারা। হলদে সবুজ ওরাং ওটাং পাতা। হলদের ভাগটাই একটু বেশি। বাঘ এই হেঁতালের হলদে-সবুজ বনে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে। বাইরে থেকে মোটে বোঝার উপায় থাকে না যে ওই ঝোপের আড়ালে আবডালে চোরা বাঘ।

বাইন হেঁতাল এই দু ধরনের ঝুপসি গাছ নদীর মুখের কাছে চরের ওপর। নদীর জলে চরডুবি হয়। সব দ্বীপেই জোয়ারের জল মাটি কেটে নালি তৈরি করেছি। ওই নালি উজিয়ে ছোটে জল জঙ্গলের ভিতর। লক্ষ্য করলাম, ওই সব নালির কাদার ওপরে এক ধরনের কুচো মাছ। লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। মেনি-গুলে নাম। গুলে বা চেঙো মাছের একফোঁটা বাচ্ছার মতন। কিন্তু কি রাগ! হাঁ করে একে অপরকে আক্রমণ করে। কামড়ায়। ধড় আর মুণ্ডুর ঠিক নিচে একরত্তি ডানা, পায়ের মতন ব্যবহার করে। জলে ডাঙায় সমান প্রতাপ। মাঝিদের মধ্যে যে যেন বললো, মেনি-গুলের টক খেলে আর ভোলা যাবে না। নিদেনপক্ষে ভাজাও চলতে পারে।

সুঁদুরি, গেওয়ান, গরান নিয়ে জঙ্গল ভিতরের দিকে জমাট, ঘন। এছাড়া আছে বাইনের শূল। শিকড় ছড়িয়ে মাটির ভিতর থেকে এই শূল উঁচু হয়ে থাকে। জন্তুজানোয়ারের থাবা এই শূলের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত হয় হামেশাই।

জলের একটা অদ্ভুত নেশা আছে—চোখে কানে আসনপিঁড়ি হয়ে বসতে থাকে। জল কেটে চলছি তো চলছিই। দুদিকে দ্বীপ, চর, গ্রাম, আলাভোলা গেরস্থালি দেখতে দেখতে নজর রাখছি, কোন চরে রোদ পোহাচ্ছে গাছের গুঁড়ির মতন কুমীর। বালিহাঁসের ঝাঁক এখানে-ওখানে। শরাল উড়িয়ে দিচ্ছে স্টিমারের ভোঁ। কে যেন বললো, একটা শটগান থাকলে মচ্ছব করা যেতো।

ফিরে এসেছি। আবার হাতানিয়া-দুয়ানিয়ার সরু খাল। দুদিকে ঘরবাড়ি বাড়ছে। তাল-খেজুর নারকোলের মাথা বাতাসে দুলছে। এতক্ষণ এই তাল খেজুর নারকোলের দেখা খুব কমই পেয়েছি। জল থেকে আঁশটে গন্ধ উঠছে। সন্ধ্যা হয়-হয়।



গেঁওখালি বাংলো থেকে খৃস্টের সেবাসদনে





দুভাবেই যাওয়া যায়। কলকাতা থেকে ডায়মণ্ড হারবারের বাসে সরষের মোড়। সেখান থেকে চুয়াত্তর নম্বর বাসে নুরপুর। আধঘণ্টায় পৌঁছুনো যাবে লনচ ঘাটে। নড়বড়ে কাঠের জেটির সামনে দাঁড়িয়ে আছে লনচ। ওপারে গেঁওখালি। মেদিনীপুর। এপার চব্বিশ পরগণা। গেঁওখালি মরা-বন্দর। এককালে রমরমা ছিলো। এখন হাটগনজের চেহারায় টিকে আছে নমো-নমো করে। গুদোমে গরান লাঠি। হোগলা। নারকোলের পাহাড়। কড়ি-বরগার জন্যে সেগুন। নোঙর ফেলার নৌকো বাঁধার কাছি তৈরি বিশিষ্ট কুটিরশিল্প। নৌকো বোঝাই ঝাঁটার কাঠি গঙ্গাপার করে।

হুগলি আর রূপনারায়ণ এখানে মিলেছে। নুরপুর থেকে ডান হাতি হুগলি পয়েন্ট। কলকাতা বন্দর প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ঝকঝকে লনচঘাট। বছর কয়েকের মধ্যে ভীষণ পালটে গেছে। বছর সাত আগে যখন গিয়েছিলাম তখন টিমটিমে হোগলা-ছাউনির শিবরাত্তিরের সলতে হরেকরকমবা দোকান। মাছভাত থেকে চা আর লেড়োবিস্কুট। ছাঁচতলায় ডাব। এখন পাকাঘরের বড়ো হোটেল। দইমিষ্টি। চা কেক। পান সিগারেট। দিশি মদ। সবকিছুই হাত বাড়ালে। কড়ি ফেললেই। আশপাশে ছিরিছাঁদঅলা ঘরবাড়ি। নদী রুখে বাঁধ। তখন একটা ভাঙাচোরা বাংলো দেখে গিয়েছিলাম। আজ আর এগিয়ে গিয়ে দেখার সময় করে উঠতে পারিনি।

ডায়মনডহারবার ইস্টিশানে নেমেও চুয়াত্তর সামনে। সেই বাসে উঠেও সোজা নুরপুর আসা যায়। সেখান থেকে চল্লিশ পয়সায় ওপার। ওপারেও বিস্তর হোটেল। পুলিশ চৌকি। ডাকবাংলো। তার দোতলায় বসে নদীতে জাহাজ চোখে পড়বে। ইলিশের সময়ে ইলিশ। অন্যসময় মিঠে পানির মাছ। পোনা বাটা কই মাগুর।

সেচবিভাগের বাংলো। মেদিনীপুর থেকে থাকার অধিকার নিতে হবে। তা না হলে ঢুকতে পাওয়া যাবে না। একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার, ইরিগেশন। তিনিই এই অধিকার দেবার মালিক। সুন্দর বাংলো। বাঁহাতি বিশাল দীঘি। সামনে ফুলের বাগান। পিছনে চৌকিদারের আস্তানা। রান্নাঘর। নিচে অর্থাৎ একতলায় ঘর দুটি, উপরে একটি চৌকি আছে। বিছানাপত্তর নেই। ওপরে ডানহাতায় ছাদ। সামনে টানা বারান্দা। চোখের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কূলহীন নদীজল। নোনা হাওয়ায় মানুষজনের গা ছাতাকালো। রান্না করবে চৌকিদার। বাসনকোসন সব আছে। ইলেকট্রিক নেই। হ্যাজাক আছে। ক্ষুদে হ্যারিকেন। দীঘির ওপাশটায় তাঁতিগ্রাম। মোটা শাড়িধুতি বোনা চলছে দিনরাত।

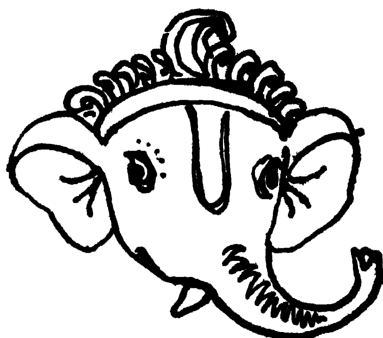
গামছা তৈরীটাই বেশী। গামছা দেখামাত্র নজর কাড়বে। বাংলোর সামনেটায় বাঁধ। বাঁধের ওপরে গোল সিমেন্টের চাতাল। গঙ্গার শোভা আয়েস করে দেখার জন্যে তৈরি করা। এটা ছেড়ে এদিক ওদিক কৃষ্ণচূড়ার ছাতার নিচে বসার বাঁধানো জায়গা। কলকাতা ছেড়ে দেড় দু ঘণ্টা গেলে এমন সুন্দর পিকনিক স্পষ্ট। ডায়মণ্ডহারবার লোক থই থই। আর এ অঞ্চল অপরূপ নির্জন। বাজারের পিছনে পাকা বাঁধ। নদী অনেক মহাল ভেঙেছে। তার চিহ্ন এখানে ওখানে ছড়ানো। পুরনো পুলিশচৌকি পর্যন্ত আজ মাঝনদীর বুকে। নদী ওপার থেকে তেড়েফুঁড়ে আসছে। তাই বাঁধা। তাই বজ্রআঁটুনি।

গেঁওখালি হয়ে ফেরার সময় আবার নুরপুর। সেখানে পথের পাশে তিরিশ বত্রিশ বিঘার নারকোল বাগান। আগেও দেখেছি, তখন গাছগুলো মানুষডচু। তকতকে ঝকঝকে বাগানের পাহারাদার বলো সেবায়েত বলো এক বৃদ্ধ কেরলের ক্রিশ্চান। কেরল থেকে শচারেক উঁচু জাতের চারা এনে বসিয়েছেন। দুটো পুকুর কাটিয়েছেন। পামপে জল দিয়েছেন গোড়ায় গোড়ায়। দু সারির মাঝখানের নালায়। বাংলোছাঁদের বাড়ি বানিয়েছেন। তিনি মারা গেলে বছর তিনেকে এখানে গড়ে উঠেছে মিশনারিজ অব চ্যারিটির সেবায়তন। মা টেরেসার সেবাপ্রতিষ্ঠানের ব্রাদার এ্যানড্রুজ এ-প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক।

শ দেড়েকের মত সহায়সম্বলহীন পঙ্গু বিকলাঙ্গ জড় এবং উন্মাদ এখানে প্রতিপালিত হচ্ছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। শুধু থাকা খাওয়া এবং যীশুর ভজনা। মাসে হাজার তিরিশেক টাকা ব্যয় হচ্ছে এদের সেবায়। দেখাশোনা করার জন্যে জনাকুড়ি ব্রাদার আছেন। সেনট জেভিয়ার্সের ফাদার কি রবিবার এদের এখানে আসেন। ম্যাস পরিচালনা করেন। সুন্দর বাংলা জানেন ভদ্রলোক। বাইবেল অনুবাদ করছেন, কথায় কথায় আমাদের জানালেন।



সাগর মেলার অন্দরে





আমাদের মধ্যে যাঁরা আগে বেশ কয়েকবার এসেছেন, তাঁরা আশ্বস্ত করলেন। একদিন আগেই যাচ্ছি আমরা। অর্থাৎ বারো তারিখ। মেলা এর পর দিন। ৩ দিন থাকবে। সংক্রান্তির স্নান মাঝের দিনে। পরদিনও স্নান। মাঘী স্নান। উত্তরায়ণ শুরু।

আসার পথে তেমন ভিড় পাইনি। শুধু নামখানায় তীর্থযাত্রীর মিছিল। সবাই এক বাক্যে স্বীকার করলেন, এখনো তেমন ভিড় নেই। আজ বিকেল-সন্ধে থেকে আসল ভিড় শুরু হবে। তবে গতবছরের তুলনায় লঞ্চ বেশি, নৌকার যোগান বেশি, প্রস্তুতি অনেক দৃঢ়। সবই অভিজ্ঞতার দান। লঞ্চ আজ পর্যন্ত সত্তরটা এসে পৌঁচেছে আরও আসবে। নৌকা আড়াই শ-র মতো। আরো জোগাড় হবে। পূর্ণকুম্ভের জন্যেই এবার সাগরে স্নান কমেছে মনে হয়।

আমি আমার কাগজের তরফ থেকে যাচ্ছি। সঙ্গে আমার সহকর্মী কিশলয় ঠাকুর আর আলোক চিত্রী দেবীপ্রসাদ সিংহ। নামখানাতেই দেখা হয়ে গেল আমাদের বিশিষ্ট সাংবাদিক বন্ধু

মনোজিৎ আর শ্যামলের সঙ্গে, অমিতাভ চক্রবর্তীর সঙ্গে, বিনয়ের সঙ্গে। আনন্দবাজার আর স্টেটসম্যানের দুটি তাঁবু পাশাপাশি। হোগলার ছাউনির মধ্যে বেশ বড়োসড়ো রান্নাঘর, বাথরুম। মূল ঘরগুলোও হোগলার। আমরা মাঝখানের হোগলার বেড়ার মধ্যে বাঘ ঢোকার মস্ত ফাঁক করে ফেললাম। এঘর থেকে ওঘরে কখন যেতে আসতে ইচ্ছে করবে—বলা তো যায় না! শ্যামল আর বিনয় হেঁসেলের ভার নিয়েছে। চটপট ওদের হাতে টাকা তুলে দিলাম। এলো এক হাতি পার্শে, দু কেজির ভেটকি। পার্শের পরিমাণ কিলো দুই হবে। রুপোর পাতের মতন ঝকঝকে ভাতের পাশে ভাজা আসবে। ভেটকি ফ্রাই হবে, ঝোলও হবে। রান্নাঘর থেকে আমাদের তাড়িয়ে শ্যামল বিনয় মাছ কোটা ভাজায় মনোনিবেশ করলো। মনোজিৎ বালির তলা থেকে তরল আগুন বের করে টেবিলে। তেল চুপচুপে পার্শে এলো এক ডজন। আমাদের সন্ধ্যাহ্নিক শুরু।

একনজরে ভিড়—আবালবৃদ্ধবণিতার। পানজাব থেকে তীর্থযাত্রী অন্যান্য বছরের তুলনায় শতকরা পঁচিশ ভাগ বেশি। এছাড়া যাত্রী আসছেন মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ গুজরাট কাশ্মীর থেকে। উত্তরপ্রদেশের যাত্রী কম। বাঙালী প্রচুর। ইন্দিরা ময়দানে বাসের জঙ্গল। সাধুসন্তের সংখ্যা কম। এখনো কোনো দুর্ঘটনার খবর নেই। কিছু হারানো প্রাপ্তির খবর আছে। নামখানায় আগের রাতে ডাকবাংলোয় পাখা চলেছে। এখন দুপুরে অসহ্য গরম। ঘাম ঝরছে। গায়ে গরমকাপড় রাখার কথাই ওঠে না। অন্যান্য বছরে বেশ ঠাণ্ডা থাকতো। ফলে এবছর অসুখ-বিসুখের মাত্রা ছড়িয়ে যাবার আশঙ্কা করছেন মেলার পরিচালকদের কেউ কেউ। কেউ বললেন, বুড়োরা বেঁচে গেলেন। শীতের কাঁটার জখমের সংখ্যা কম হবে।

প্রত্যেক বছরেই হয়, এ বছর যেন বেশি। অনেকেই ৮ তারিখ

নাগাদ এসে স্নান করে এগারোর মধ্যে ফিরে গেছেন। কুম্ভেও যেতে হবে বলে হয়তো পূর্বাহ্ণেই স্নান করে নিলেন তাঁরা। পাপ মোচনের পর পুণ্যসঞ্চয় তো কম জরুরী নয়।

বারোর সন্ধ্যেয় পৌঁছেই একটা চক্কর লাগালাম। যে যেদিকে পারলো ছুঁচের কোঁড় তুলে এগুলো। মন্দিরের কাছে, হোগলা-টুঙিতে সারি সারি নাঙ্গা সাধু বসে গেছে ধুনি জ্বালিয়ে। সামনে ত্রিশূল গাঁথা। আরামকেদারায় শোবার ভঙ্গি অনেকের। তেমন তৎপরতা এখনি নেই। মন্দিরের সামনে ভুরুর মতন এক চিলতে ভিড়। জলের ধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কেউ। দুসারে ভিখিরি কুঠো খোঁড়া আর সুরদাস বসে পড়েছে। বিছানো কাপড়ে পয়সা দুটো একটা। হয়তো নিজেরাই ফেলেছে। টিউকলে জল না পড়লে ওপর দিয়ে জল ঢালার মতন দু এক মগ জলের মতন এই পয়সা-কড়ি। দোকানে ভিড় নেই। সব দোকান সাজানোও নেই। বালি ভেঙে খালি পায়ে চলেছি। ইটের বদলে নারকোলমালা তিনটে বসিয়ে উনুন। ওপরে তিজেল মালসা। নিচে হোগলা আর কাঠে ধিকি ধিকি আগুন। ভাত ফোটার গন্ধ বাতাসে। মেলায় জোয়ার আসেনি। নদীর জোয়ারে পার হচ্ছে যাত্রী। রাতের ভিতর পৌঁছবে।

হঠাৎ দেখি তাঁবুর ভিতরে সুবল ঢুকে পড়েছে। মানে, সুবল কুণ্ডু—কুণ্ডু স্পেশালের। ওর সঙ্গে কাশ্মীরে দেখা। প্রথম দেখাতেই প্রেম। সেই প্রেমের টানেই সুবল এসে হাজির। বললো, তীর্থযাত্রীদের নিয়ে সাগরে এসেছে। কোঠাবাড়িতে রেখেছে। খাওয়া-দাওয়ার তো তুলনা নেই। আমরা গুলমার্গ

আর পহেলগাম-এ দুদিন ওর অতিথি ছিলাম। এখানেও পুরো সাংবাদিক দলকে ও রাতের নেমতন্ন করে ফেললো। পোলাও মাংস, পানসুপারি। কাশ্মীরে আমরা ঠিক ওর সঙ্গে যাই নি। ওর ওখানে দুদিনের আতিথ্যে, ঠিক করে ফেলেছিলাম দূরপাল্লায় ওর সঙ্গে ভেসে পড়াটা সব থেকে জরুরী।

আজ মেলার শেষ দিন। কাল ভোরে ওরা ফিরবে। আমরাও সন্ধের মধ্যে কলকাতায় পৌঁছুতে চাই। দেখা যাক, সরকারি ব্যবস্থায় লনচ কখন ঘাট্টে ভেড়ে। তিনটে দিন চিত্তসুখে মেলার মধ্যে কেমন মিলিয়ে গেল।



বনবাংলো রোগোদ

রাঁচীঘাট ধরে ঘুরতে-ফিরতে অনেকবারই নজরে পড়েছে— হলুদ কাঠের একটি খণ্ডের ওপর কালো অক্ষরে লেখা রোগোদ, ১০ মীল। খণ্ডটি গাছের গায়ে লটকানো। গাছের পা থেকে নিচের বনজঙ্গলে মুখ ডুবিয়ে গিয়েছে লাল মরামের বনপথ। ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে পথ কখনো ডানে পাহাড় রেখে, কখনো বাঁয়ে, চূড়োর দিকে উঠে গেছে। টেবো আর হেসাড়ির মাঝ বরাবর বাঁ-হাতি ঐ কাষ্ঠখণ্ড-মণ্ডিত পথটি ছাড়া আরো দুটি পথ আছে বাংলোর দিকে। অনেক শুঁড়িপথও থাকা সম্ভব, আমি জানি না। এবারে গেলাম চাইবাসা থেকে চক্রধরপুর এবং চক্রধরপুর থেকে ঘাটগুরুর গ্রাম নাকটি পর্যন্ত। সেখান থেকে বাঁ-হাতি পাহাড়পথে। নির্জন পথ। সাত-আটমাইল বাদে ওরাঁও কুই-এর দেখা মিললো। জীপ আস্তে ধীরে চলেছে। জন্তুজানোয়ার থই থই করছে এই সোংরা রেনজে, এমন একটা কথা শুনে আসছি দীর্ঘদিন ধরে। দল বেঁধে হাতি বেরোয়। চকিত চিতা ঝাঁপ দিয়ে পড়ে কখনো। ভাল্লুক বনফুল খেয়ে ধূলোয় গড়ায়। এইসব ভয়ংকর কথায় শুধুই জলতেষ্টা পায়। জিপের চালের ওপর দিয়ে জংলী মুরগি উড়ে গেলেও জিপশুদ্ধ মানুষের শরীর থর থর করে কেঁপে ওঠে। তাও চোখে নেশা আর বুকে ভরসা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া।

এখন চৈত্রের শেষপাদ। পলাশ ঝরে গাছে পাতা এসেছে। শিমুলের তুলোভরা ফল ডালে ডালে বাদুড়-ঝোলা। জাকারাণ্ডায় ফুল নেই। বাথরুমে মাথার ওপর জলের ঝাঁঝরি যেমন, তেমনি হাজার হাজার ঝাঁঝরি খুলে মহুয়া ফল ছড়িয়ে পড়ছে মাটিতে। আঙুরের মত টসটসে রসেভরা। কালো ছেলেমেয়ে বুড়িরা ঝাঁকা ভরতি করছে। দুপুরে জঙ্গলে হাওয়া বন্ধ থাকে। মহুয়া তাই ঝরে সকালে আর বিকেলে। ওরা কুড়িয়ে আনে ধানের মতো নিকোনো উঠোনে শুকোতে দেয়। সেদ্ধ করে রসভরা ঐ ফল ছাতুর সঙ্গে সুন্দর টাকনা। তেল তৈরি করে গায়ে মাখে। রসহীন মহুয়া ফল গরু ছাগলের জাব। আর কী? এ যেন কামধেনু। এক ধরনের মদ যেমন হয়, তেমনি বিশুদ্ধ মহুয়া বাচ্চাদের সর্দি বসতে দেয় না বুকে। চোট লাগলে দু একবার মালিশ করলেই আর ব্যথা নেই।

তবু গোটা জঙ্গলের এখন একটু কাঙাল কাঙাল চেহারা। পাতা ঝরে নিচে পাতার পাহাড়। বাতাসে ঘুরতে শুরু করেছে। আঁধির বাল্যকাল এখন। পাতার পাহাড়ে আগুন লাগানো হচ্ছে। ধিকিধিকি আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। সন্ধে থেকে সারারাত একরকম আগুনের মালা দেখা যাবে এ-পাহাড় ও-পাহাড়ে।

নাকটি থেকে রোগোদ বনবাংলোয় পৌঁছুতে দেড় ঘণ্টা লাগলো। চতুর্দিকে বৃষ্টির অপেক্ষা করছে জঙ্গল আর পাহাড়। তারই মধ্যে একটু ভদ্রমতন চেহারা ঐ চেনাশুনা আমগাছগুলোর, শালের আর সেগুনের, শিরীষের আর শিশুর, জারুলের আর দেবদারুর। আর কারুর নয়।

আমরা তিনটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম বাংলোর উঠোনে। পাহাড়চুড়ো চ্যাপটা করে সুন্দর দু-ঘরা বাংলো। জল কুয়ো থেকে টানতে হলো। চৌকিদার আছে, বিছানা মাদুর নেয়ারের খাট সবই আছে। মশা নেই, মাছি নেই। প্রাঙ্গণ ভরে আছে

কাজুবাদাম গাছ, আমের ভারে ডালপালা নুয়ে পড়েছে। তিন-চারটি কুঁচফলের গাছে কুঁচ, পোড়া চিনির ড্যালার মতন। টক-মিষ্টি স্বাদ কি অপরূপ! চাইবাসা থেকে একটা দেড় কেজির মোরগ আর চক্রধরপুর বাজার থেকে চাল-নুন-মসলা। লকড়ির অভাব নেই জঙ্গলে। বাসন-কোসন আলমারি ভর্তি। একপাশে কাঠের ঝুলন্ত পাটাতন। তার ওপর বসে চোখ ঘুরিয়ে ছাখো নীল পাহাড় আর যদি চোখে পড়ে বুনো জন্তু—তাও দেখে নাও। সিঁড়ি বেয়ে বেশ কয়েক ফুট ওপরে একটা বাঁধানো চাতাল। মাথায় ছাতা। সেখান থেকে কী বৃষ্টির রূপ দেখতে হবে?

সাধারণত বাংলোয় পা দিয়ে আমি চারপাশটা দেখে নিই। তারপরই চৌকিদারকে বলি রেজিস্ট্রারটা আনতে। রোগোদের বত্তিরিশ পাতার এই হলদে বইটি আমার থেকেও বয়সে বড়ো। ১৯৪২ সালে প্রবোধ সান্যাল মশায় এসেছিলেন গইলকেরার দিক থেকে। তাঁর সংগে ছিলেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। আজ তিনি নেই। ১৯৭২-এ গিয়েছিলেন সপরিবারে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। কাজকর্ম ছাড়া শুধুই প্রকৃতির টানে এই ভয়ংকর সুন্দর বাংলোয় এসেছেন অনেকে। শোনা গেলো বীরসা ভগবান সামনের ঐ পাহাড় থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। সেজন্মে এ-অঞ্চলে নেশাভাঙ কেউ করে না। তাঁর নির্দেশ আছে। এরা সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মানে। কুর্চি ফুলে রোদ পড়েছে। তার গন্ধে জঙ্গল মাতাল। প্রকৃতির এই বুনো রূপ দেখতে হলে রোগোদে আসতে হবেই।

তরাইয়ের বনেপাহাড়ে

তরাইয়ের অরণ্যে রাত্রি নেমেছিল ঘন হয়ে। জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন গাছগাছালিকে সার্চলাইটের উগ্র সাদা আলোয় ধাঁধিয়ে দিয়ে আমাদের গাড়ি চলছিল। সহযাত্রীরা ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম নেই আমার চোখে।

ভূতুড়ে অন্ধকার গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে-থাকা অতিকায় দৈত্যের মত শালগাছগুলোর ভেতরে ভেতরে জোনাকি জ্বলছে। ট্রেনের সুতীব্র সার্চলাইটের আলোকরেখার বাইরে সমস্ত জঙ্গলটায় যেন প্রেতপুরীর জমাট অন্ধকার। বেশ বুঝতে পারা যায়—রাত্রির তমসায় আদিম হিংসা সজাগ হয়ে উঠেছে অরণ্যের দিকে দিকে। হয়তো হাতীর পাল ঘুরছে দূরে কোন পাহাড়ের পাথর গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে; ঝোপের ভেতরে হয়তো কোন অজগর নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে আছে অসতর্ক শিকারের আশায়; হয়তো কোন গভীর অন্ধকার খাদের ভেতরে জ্বলজ্বল করছে ক্ষুধার্ত কোন বাঘের চোখ।

তরাই।

টেরাই—ওয়ান অফ দি ফিয়ার্সেষ্ট ফরেষ্টস—কোন সুদূর শৈশবে পড়েছি তরাইয়ের শাল-সেগুনে সমাকীর্ণ গভীর অরণ্য

শ্বাপদসঙ্কুল আর সেখানে প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতার রাজত্ব। গাড়ির একটানা আওয়াজকেও ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে তীক্ষ্ণ, গম্ভীর শব্দ—বুনো হাতীর ডাক। শালবীথির ভেতরে ময়ূরের পাখা ঝাপটানি চলছে মাঝে মাঝে। দূরে কোথায় একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল। রাত্রি ঘোষণা করে গেল শেয়ালের দল।

আমার কামরাটা ছিল ইঞ্জিনের ঠিক পিছনে। তাই স্পষ্ট নজরে পড়ছিল, গাড়ির সার্চলাইটের সেই সঙ্কীর্ণ আলোকবৃত্তের ভেতরে এক একটা জানোয়ার কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে ইঞ্জিনের প্রচণ্ড আওয়াজে ছুটে পালাচ্ছে।

ওই যে জানোয়ারগুলো দেখছেন—ওগুলো হয় সম্বর—না হয় হায়েনা—এই তো কয়েকদিন আগে লাইনের ওপরে বাঘ বসেছিল—

তারপরে ?

তারপরে আর কি হুইসল দিয়ে দিয়ে ব্যাঘ্রমহারাজকে সরিয়ে দিতে হলো—যাত্রীদের টুকরো টুকরো কথা আজও আমার মনে আছে। এসব কথা ১৯৪৮ সালের।

কোন সুদূর বাল্যকালে একবার রংপুর জেলার লালমণিরহাটে গাড়ীবদল করে বি. ডি. আর. (বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ে) এর সবুজ রঙের ছোট গাড়িতে উঠেছিলাম। মিটার গেজের সেই রেললাইন ডুয়ার্সের নিবিড় অরণ্য সমাকীর্ণ অঞ্চলের ভেতর দিয়ে প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার সেই বনে থোকা থোকা আগুনের ফুলের মত কোথাও দাউ দাউ করে দাবানল জ্বলছিল ; আবার কোথাও দূরে উঁচু পাহাড়ের গায়ে গায়ে আলোর দীপালি। আগেকার সেই শ্বাপদ-অধ্যুষিত আরণ্যক প্রদেশের ভেতর দিয়ে সেই রাত্রে ভ্রমণের রোমাঞ্চকর স্মৃতি আজও আমার চেতনার ভেতরে অপরূপ ইন্দ্রজালের মত।

আবার শিলিগুড়ি হয়ে সেই পথ দিয়ে আসাম। সময়টাও

ছিল সেই মধ্যরাত্রি। তবে আকাশে ছিল কৃষ্ণপক্ষের ম্লান পাণ্ডুর চাঁদ। তার মেটে মেটে আলোয় স্পষ্ট দেখলাম ব্রডগেজ লাইনের দ্রুত ধাবমান এ. টি. মেলের দুপাশে একটির পর একটি ষ্টেশন—বানারহাট, চ্যাংমারি, কেরেণ—ডুয়ার্সের একদা জঙ্গলাকীর্ণ এক একটি জনপদ এক একটি বিন্দুর মত মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় সেই অরণ্য ?—কোথায় সেই রেললাইনের ওপরে থাবা গেড়ে বাঘের বসে থাকা ? কোথায় বা ট্রেনের সেই উগ্র সাদা সার্চলাইটের বৃত্তের ভেতর দিয়ে কেউ বা হায়েনার চলাফেরা।

রেললাইনের দুপাশে কোথাও ধূ ধূ করছে নিঃসীম প্রান্তর ; কোথাও অতিকায় ঘাতকের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে ন্যাড়া পাহাড় আবার কোথাও বা দূর প্রসারিত চা বাগান নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত গা এলিয়ে পড়ে রয়েছে। আর সেই চা-বাগিচার জন্যেই গড়ে ওঠা ডুয়ার্স অঞ্চলের ছোট ছোট শহরগুলো বিজলী বাতি আর নিওন আলোয় ঝলমল করছে। হিংস্র জন্তুজানোয়ারের অবাধ বিচরণ-ক্ষেত্র সেই ওয়ান অফ দি ফিয়ার্সেষ্ট—টেরাইয়ের কোন চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও নেই—

কে করল এই অরণ্য সংহার ?

বন্যপ্রাণী-নিধন যজ্ঞই বা কারা করল, কবে করল ?

আমার মনে চিন্তার প্রবাহ ওঠা নামা করতে লাগল। মনের ভেতরে গুনগুন করে উঠল বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের এক মহানায়ক এবং জহরলাল নেহেরুর স্নেহধন্য ই. পি. জীর সেই আক্ষেপোক্তি :

'৪৫ এর যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্যে কাঠ জোগাতে গিয়ে বহু অরণ্য অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেল। সৈন্যরাও নতুন আবিষ্কৃত জীপ আর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে অনেক আরণ্যক প্রাণী নিধন করেছিল।

মানুষের প্রয়োজনে অর্থাৎ সভ্যতা বিস্তারের অনিবার্য তাগিদে নির্মূল করা হয়েছে প্রকৃতিকে, সেইসঙ্গে আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই

নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে হিংস্র বন্যপ্রাণীদের। এই সত্যটি যেমন সর্বজনবিদিত তেমনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে বিশ্ব বন্য প্রাণী ভাণ্ডারের (World Life Fund International) প্রেসিডেন্ট নেদারল্যাণ্ডের রাজতনয়-এর (H. R.H.) সতর্কবাণীর। অর্থাৎ প্রাণী এবং উদ্ভিদজীবনের প্রকৃতির জীবন্ত সবকিছুর সঙ্গে মানুষের অস্তিত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটা প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিলেই বিষয়টি সহজ হয়ে যাবে।

একথা কে জানে না যে বৃষ্টিপাতকে প্রভাবিত করে ঘনসন্নিবদ্ধ তরুশ্রেণীতে সমাচ্ছন্ন নিবিড় অরণ্য। বর্ষার জলে বিস্তীর্ণ প্রান্তর শস্যসম্ভারে ভরে ওঠে। ক্রমবর্দ্ধমান লোকসংখ্যা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জঙ্গল কেটে সৈন্যশিবির তৈরি, শাল-সেগুন-জারুল কাঠের নিয়মিত সরবরাহ ইত্যাদি আরও বহুবিধ কারণে নির্মমভাবে অরণ্যকে নির্মূল করার ভয়াবহ পরিণতি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়ে ওঠে রাঙ্কাওয়া লিখিত এবং জার্নাল অফ বোম্বে ন্যাচার‍্যাল হিস্ট্রি সোসাইটি প্রকাশিত গবেষণামূলক নিবন্ধে। বিগত দু হাজার বছর ধরে নিরবিচ্ছিন্নভাবে বনজঙ্গল কাটার ফলে উত্তর ভারতে যেখানে ২০০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হতো—সেখানে হয় মাত্র ৬০০ মিলি-মিটার। আর তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দেখা গিয়েছে—একদা শস্যশ্যামলা উর্বর প্রান্তর হয়ে গিয়েছে রুক্ষ, নীরস ও বন্ধ্যা। শাল-সেগুন-অর্জুন ইত্যাদি আর্দ্র আবহাওয়ার গাছপালার বদলে দেখা গেল মরুপ্রান্তরের বাবলা ও মনসা জাতীয় কাঁটা গাছ আর ছোট ছোট ঝোপের কণ্টক অরণ্য। আর তার ফলে কি হলো ?

বৃষ্টি ভেজা জলজঙ্গলের ঘন অরণ্যে বাস করতে অভ্যস্ত যেসব বন্যপ্রাণী তারা হাজারে হাজারে শখের শিকারীদের বন্দুকের গুলিতে প্রাণ দিতে লাগল আর যারা বাঁচল তারা শাল-সেগুনে ঘেরা ভিজে ভিজে নিবিড় বনভূমির খোঁজে দূরদূরান্তরে চলে গেল।

জলজঙ্গলে বাস করে যেসব ভয়াল হিংস্র প্রাণী তার ভেতরে

অন্যতম হলো গণ্ডার। একদা পেশোয়ার থেকে শুরু করে আসাম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ গাঙ্গেয় উপত্যকা জুড়ে যে ঘন অরণ্য ছিল, সেই বনভূমিতে অবাধে বিচরণ করতো গণ্ডার। তার ঐতিহাসিক প্রমাণ —সম্রাট হুমায়ুন দিল্লীর কাছাকাছি কোথাও গণ্ডার শিকার করেছিলেন। সেই বহু উপকথা আর কিংবদন্তী জড়ানো এই প্রাণীটি দেখতে হলে, এখন যেতে হবে আসামের কাজিরাঙ্গায়, পশ্চিম বাংলার জলদাপাড়া, গোরুমারা, চাপড়ামারি প্রাণিনিবাসে।

শুধু গণ্ডার নয়, বাঘ-সিংহ-বুনো হাতি ইত্যাদি অন্যান্য বন্য-প্রাণীদের বিলুপ্তি এবং ক্রুত বিরল হয়ে আসার একমাত্র কারণ যে সভ্যতার সর্বগ্রাসী প্রয়োজন এবিষয়ে কারো দ্বিমত নেই।

কিন্তু —

ভারতের বনবনান্ত যদি শ্বাপদশূন্য হয়, যদি সত্য হয়ে যায় বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ই. পি. জীর সেই মর্মান্তিক ভবিষ্যদ্বাণী—আগামী ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে বন্যপ্রাণীর স্বাক্ষর বহন করে বেড়াবে শুধু শেয়াল, ইঁদুর, শকুন, চিল কাক আর চড়ুই (এরা উড়তে পারে বলেই সবচেয়ে শেষে নিশ্চিহ্ন হবে)। তাহলে কি ক্ষতি হবে মানুষের যদি জল-জঙ্গলে শান্ত পদক্ষেপে রাজকীয় ভঙ্গিতে বিচরণশীল গণ্ডার দেখতে না পাওয়া যায় ?

নিশ্চয়ই ক্ষতি হবে। শুধু যে আমাদের দেশ থেকে বুনো হাতি কি বাঘ-সিংহ-গণ্ডার বিদেশের চিড়িয়াখানায় বিক্রি হবে না, তাই নয়। এদেশের গণ্ডার অধ্যুষিত কাজিরাঙ্গা, জলদাপাড়া, গোরুমারা, হিংস্র ভয়াল মানুষখেকো বাঘের অবাধ বিচরণভূমি করবেট পার্ক, সিংহের লীলাভূমি গির অরণ্য ইত্যাদি দেশের দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন স্যাঙ্কচুয়ারীতে অধিক সংখ্যক বিদেশী ভ্রমণকারীদের আকর্ষণ করে বহুল পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা উপার্জনও বন্ধ হয়ে যাবে। শুধু আর্থিক ক্ষতি হবে তা নয়। আরো যা ক্ষতি হবে তা পরোক্ষ ক্ষতি।

উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগতের সঙ্গে মানুষের আদিকালের সম্বন্ধ। আর সৃষ্টির প্রথম প্রত্যুষের সেই সম্বন্ধটিকে মানুষ আজও ভুলতে পারে নি বলেই সে কংক্রীটের বিশাল প্রাসাদোপম সৌধ তৈরী করেও তার ছাদে মাটির টবে নানাবর্ণের ফুলের গাছ লাগায়; চিড়িয়াখানায় বহু আয়াসে হিংস্র বন্যপ্রাণী ধরে এনে রেখে তাদের বিচিত্র চালচলন আর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য দেখে আনন্দে অভিভূত হয়।

শুধু আনন্দ নয়। আরণ্যক প্রাণীদের স্বভাবের নানা রোমাঞ্চকর বৈশিষ্ট্যের (বাঘের চরম হিংস্রতা, শেয়ালের ধূর্ততা, কাকের তীব্র বুদ্ধি ইত্যাদি) ভেতরে মানুষের শিক্ষারও অনেক কিছু আছে। তাই হাজার হাজার বছরের ব্যবধানে এসেও হিতোপদেশের সেই বোকা বোকা সিংহ আর খরগোসের, কলসীর তলায় পাথরের টুকরো ফেলে ফেলে তৃষ্ণার্ত সেই তীব্রবুদ্ধি সম্পন্ন কাকের জল খাওয়া ইত্যাদি আশ্চর্য গল্পগুলো আজও পুরনো হয়ে গেল না। শুধু আমাদের দেশেই নয়, জন্তুজানোয়ারের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সহজাত বলেই পৃথিবীর সব দেশের নীতি শিক্ষা-কাহিনীর কুশীলব হলো—বাঘ-সিংহ-হাতি ইত্যাদি বন্যপ্রাণী। বার্টন সাহেব স্পষ্টই বলেছেন—সুদূর অতীতে আমাদের পূর্বসূরীরা মানুষের জীবনে বন্যপ্রাণীর এই অবদানের কথা জানতেন বলেই কৌটিল্য (খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক) আরণ্যক প্রাণীকে সযত্নে রক্ষা করার বিধান দিয়েছেন—

অভয়বনমৃগয়াঃ পরিগৃহীতাঃ ভক্ষয়স্তু স্বামিনো নিবেদ্য যথা অবধ্যাস্থথা প্রতিষেদ্ধব্যাঃ।

অর্থাৎ অভয়বনের মৃগেরা যেন প্রপীড়িত বা হতাহত না হয়····—এই শ্লোক থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, প্রাকৃতিক সম্পদ তথা বন্যপ্রাণীকে রক্ষা করা ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে রয়েছে। বহু দেরীতে হলেও ১৯৫২ সালে ভারতীয় বণ্যপ্রাণী পর্ষৎ

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম এবং মধ্য ভারতে প্রায় উনিশটি প্রাণিনিবাসও স্থাপিত হয়েছে। সম্প্রতি কেরালা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ ও হিমাচল প্রদেশ এই পাঁচটি রাজ্যে বৃক্ষছেদন বন্ধ করবার জন্য আইন পাশ হয়েছে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারও সমস্ত রাজ্যগুলিকে নির্বিচারে বৃক্ষ উৎপাটন বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। আশা করা যায় অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলি আইনের মাধ্যমে বৃক্ষছেদন বন্ধ করার ফলে আবার শ্যামল বনভূমিতে প্রাণীদের স্বচ্ছন্দ বিচরণের ও তাদের বংশবৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হবে। তাই অনায়াসেই বলা যায়, ভবিষ্যতে আমাদের উত্তরসূরীদের আর যাদুঘরে গিয়ে গণ্ডার বা বাঘ সিংহের কঙ্কাল দেখে একদা ভারতের বনভূমিতে তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে না। তারা ঘনসন্নিবদ্ধ সুন্দরী গাছে ঘেরা সুন্দরবনের লোথিয়ান স্যাংচুয়ারীতে গেলেই দেখতে পাবে—অরণ্যের রাজা ডোরাকাটা বাঘ দৃপ্তভঙ্গীতে চলাফেরা করছে। গির অরণ্যে গেলে দেখতে পাবে রক্তবর্ণ পলাশ গাছের বনছায়ায় কেশর ফুলিয়ে গর্জন করছে সিংহ, ভরতপুরের পক্ষিনিবাসে গেলে পানকৌড়ি চামচবাজা লাল কাক আর সারসের কাকলিতে তারা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে।

ডুয়ারসে বেড়াতে গেলে জলপাইগুড়ি শহরকে খুঁটি করতে হবে। কেননা, যাবতীয় বাস ওখান থেকেই সকাল-সন্ধে ডুয়ারসের বনেজঙ্গলে চা বাগানে ছড়িয়ে পড়ে। এমন কি, যদি আপনি ভুটান যেতে চান, তো চামুরচি পর্যন্ত বাস ওখান থেকে মিলবে। চামুরচি আমাদের সীমান্ত। তারপরেই সামচি। ভুটানের

পশ্চিমপ্রান্তের নামজাদা শহর। চামুরচি থেকে সামচির বাস ভুটান সরকারের। চামুরচিতে ছোটখাটো হোটেল আছে। আছে পি ডবলু রেস্ট শেড। সামচি শহরটায় ভুটান সরকারের নিজস্ব অতিথিশালা আছে। সামচি বাজারে আছে মাঝারি ধরনের থাকার জায়গা। সারকিট হাউস আছে। ভারত সরকার ভুটান সরকারকে সাহায্য করার জন্যে জিওলজিক্যাল সার্ভের অফিস করে দিয়েছেন। সেখানে প্রচুর বাঙালী। তাঁদের কাছে গিয়ে পড়লেও এক-দুদিনের ব্যবস্থা অনায়াসেই হয়ে যাবে। সামচির গায়েই ডায়না নদী। তার গায়ে ডায়না পাহাড়। এ-অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যের তুলনা হয় না। পাহাড়ের মাথায় চড়ে বসেছে শহরের একটা টুকরো। সেখানের কোনো বারান্দায় বসে সমতল আর দিগন্তের সবটুকুর উন্মোচন দেখা এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা।

ডুয়ারসের কোথায় যাবেন না ? এমন কথা হয় না। ডুয়ারস ভ্রমণকারীর কাছে স্বর্গবিশেষ। লাটাগুড়ি, চিলাপাতা রেনজ, দলসিংপাড়ার গভীর জঙ্গল। সর্বত্র থাকার জায়গা আছে। কোথাও বনবাংলো, কোথাও বা পূর্ত বিভাগের। গয়েরকাটায় খুঁটিমারি জন্তুজানোয়ারের জন্যে বিখ্যাত। সেখানেও দোতলা সুন্দর বাংলো পাবেন আপনি। বনবাংলো। বাংলোর চতুর্দিকে মেহগনি আর হর্তুকির জঙ্গল। শালপিয়াল তো আছেই। এই গয়েরকাটা থেকে যান হাসিমারা। হাসিমারার আগেই পড়বে জলদাপাড়া ফরেস্ট। বড়দাবড়ি বাংলোয় ঘর একতলা দোতলা করে অনেকগুলো। আগে থেকে রিজারভেশন করে যাওয়া প্রয়োজন। রাত্তিরটা থাকতেই হবে। হাতি ঠিক করে রাখতে হবে। তাহলেই তার পিঠে চড়ে অন্ধকার থাকতে-থাকতে জঙ্গলে ঢোকা। মাইল খানেক গেলেই গণ্ডার। তারপর কপাল ভালো হলে বাঘ ভাল্লুক হাতি। হরিণ বিস্তর।

বড়দাবড়ি যেদিকে, ঠিক তার উলটোদিকে ঐ একই জঙ্গলের মধ্যে এই বছর দুই হলো হলং ডাকবাংলো খোলা হয়েছে। দুজনের জন্যে ২০ টাকা দিনে। খাওয়া আলাদা। মাদারিহাট থেকে যেতে হবে। দোতলা বাংলো। সম্পূর্ণ কাঠ দিয়ে তৈরি। এক একটি ঘর, এক-একরকম কাঠে তৈরি করা হয়েছে। সেই কাঠের নাম দেয়ালে, ফলকে। চালসা, মেটেলি, সামসিং, ঝালং, বীরপারা, দোমহনি, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি যেখানেই যান বাংলো। এবং ডুয়ার্সে এতো বাংলো ছড়ানো যে খুব কম লোকই এক জীবনে তার সব কটাতে থাকতে পেরেছে।

হাসিমারা থেকে ইচ্ছে করলে আপনি ভুটানের ফুনটশোলিং যেতে পারেন। রাজধানী থিমপু। থিমপুতে যেতে হলে একটা সামান্য অনুমতিপত্র লাগে। তার ব্যবস্থা ফুনটশোলিং-এ হয়ে যাবে। থিমপু ফুনটশোলিং-এ বাংলো সারকিট হাউস ছাড়াও অজস্র হোটেল। বড় ছোট মাঝারি। পকেট বুঝে তাদের কোনো একটি বেছে নিন। দ্বারবঙ্গ বা দ্বারভাঙা যেমন বাংলা দেশের দরজা, এই ডুয়ার্সও তেমনি ভুটানের রোমাঞ্চকর সৌন্দর্য দেখার দরজা বিশেষ।

নির্দেশিকা

শিলিগুড়ি থেকে ঝালং

শিলিগুড়ি নতুনবাজার থেকে বাস পাবেন। ঐ বাসস্ট্যাণ্ড থেকে তিস্তাবাজার আর কালিমপঙের বাস জিপ মুহুর্মুহু। ঝালং-এর বাস সকাল ৮ টার সময়। সেভোকে পৌঁছুতে একঘণ্টা। করোনেশন ব্রিজ। তিস্তা ঠিক এখান থেকেই পাহাড় ছেড়ে সমতলে নেমেছে। ব্রিজের বাম তীর ঘেঁসে কালিমপঙ-গ্যাংটকের রাস্তা। কালীঝোরার কথা আগেই লিখেছি। সেভোক থেকে ৮ কিলোমিটার পথ। ছিপছিপে পাহাড়ি নদী কালীঝোরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে তিস্তার গায়ে। পি ডবলু ডি-র পরিদর্শন বাংলা ছাড়াও বনবিভাগের সুন্দর একটি বিশ্রামাগার বা রেস্ট-শেড রয়েছে। কালীঝোরার বাঁদিকে মহানদী স্যাঙ্কচুয়ারি। কালীর পর শ্বেতীঝোরা। বড়োসড়ো পাহাড়ি নদী। তারপর রেয়ং বাজার। এখান থেকে মংপু যাবার উঁচুনিচু পথ। জিপ ছাড়া অন্য কিছুতে যাওয়া অসম্ভব। রেয়ং-এ বনবাংলো আছে।

কালীঝোরা	রংপো	গরুমারা	ঝালং
শ্বেরীঝোরা	গরুবাথান	সামসিং	হলং
রেয়ং	লাভা	চাপড়ামারি	রাজাভাতখাওয়া
তিস্তাবাজার	চালসা	খুঘানী	জয়ন্তী বকসাদুয়ার

তিস্তাবাজার থেকে গ্যাংটকের যে রাস্তা গেছে, সেই রাস্তা ধরে ২২ কিলোমিটার গেলে পড়বে রংপো। এখানে তিস্তার ধারে বনবাংলো আছে।

সেভোক পরি হলে গভীর জঙ্গলের মধ্যে ডামডিম থেকে গরুবাথান যাবার পথ। ১৩ কিমি। এখানেও বনবিভাগের রেস্ট শেড আছে। পাহাড়ি নদীটির নাম চেল। গরুবাথান তারই পাশে।

কাছেই ডালিং দুর্গ। ৪২ কি মি উত্তরে লাভা। লাভায় আছে বনবিভাগের বাংলো। ডামডিমের পরের ষ্টেশন নিউ মাল জংশন। তারপরে চালসা। চালসা থেকে মেটেলি ব্রাঞ্চ লাইন আছে। বেশ কিছুকাল বন্ধ। চালসা স্টেশনের সামনেই চালসা পাহাড়। পিছনে চা বাগান মাইলের পর মাইল ধরে। পূর্ত বিভাগের বাংলো আছে এখানে। এখান থেকে ময়নাগুড়ি যাবার বাসরাস্তায় বড় দীঘির মোড়। সেখান থেকে ৪ কিমি গেলে গরুমারা স্যাঙ্কচুয়ারি। একশৃঙ্গী গণ্ডার ছাড়া বাইসন, বুনো শুয়োর, চিতল, কাঁকর। বনবিভাগের বাংলো আছে। জঙ্গলে ঘোরার জন্যে জিপ পাওয়া যাবে।

চালসা থেকে মেটেলি। এই মেটেলি থেকে পথ গেছে চা বাগানের মধ্যে দিয়ে সামসিং। গভীর জঙ্গল। চড়াই। আমরা গাড়ি থেকে নেমে সোজা গিয়ে উঠলাম কাঠের দোতলা বাংলোয়। একতলায় কিছু নেই। কাঠের থাম দোতলার দুটো ঘর ধরে রেখেছে। হাতির জন্যেই এই দোতলা। সামনেই ভুটানপাহাড় সামসিং আর ভুটানপাহাড়ের মাঝখানে গভীর খাদ। সেই খাদভরে কুলকুলিয়ে বয়ে যাচ্ছে জয়ন্তী নদীর নীল জল।

চালসার পরের ষ্টেশন চাপড়ামারি। অভয়ারণ্য। তবে খুব ছোট। বাংলো আছে। বেশ কিছু জন্তুজানোয়ারও আছে জঙ্গলে। ঝালং ৩০ কি মি। পথিমধ্যে খুমানীতে বনবাংলো। ঝালং-এর কাছেই জলঢাকা। এই নদীর জলের উপর নির্ভর করেই জলঢাকা হাইডাল প্রজেকট।

বানারহাট। বানারহাটের পর বিন্নাগুড়ি। বড়ো মিলিটারি ছাউনি। এরপর বীরপাড়া। তারপর মাদারিহাট। এখান থেকে ৬ কিমি দূরে হলং ডাকবাংলো। টোটো আদিবাসী বসতি, টোটোপাহাড়ও কাছে। তারপর হাসিমারা। মিলিটারী ছাউনি। হাসিমারার পর রাজাভাতখাওয়া জংশন। বনবাংলো আছে। খুব

কাছেই জয়ন্তী আর বকসাদুয়ার। দুজায়গাতেই বনবাংলো। জয়ন্তীতে পূর্ত বিভাগেরও একটি বাংলো আছে।

রাজাভাতখাওয়ার পর জঙ্গল শেষ। আলিপুরদুয়ার। শহর। যাত্রা স্থগিত ॥

সুন্দরবনের সজনেখালি পাখিরালয়

সজনেখালি অঞ্চলে একটি অভয়ারণ্য। পশ্চিমবঙ্গের বৃত্ততম অভয়ারণ্য এটি। বর্ষায় প্রচুর পাখি সজনেখালির সুঁদুরি, গেওয়া, বাইন প্রভৃতি গাছে বাসা বাঁধে। কাছাকাছি পর্যটন বাংলো নেই। পর্যটকদের অসুবিধা প্রচণ্ড। গোসাবার স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের বাড়িটি যদি রাজ্যসরকার এ ব্যাপারে কাজে লাগাতে পারেন, তাহলে বহু বিদেশি পর্যটক অনায়াসে আসতে পারেন। বিদেশি মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে আমদানি হবে। প্রতি বছর এখানে ২৮ থেকে ৩০ প্রজাতির প্রায় কয়েক হাজার পাখি আসে, বাসা বাঁধে। বক, কাস্তেচূড়া, শামুকখোল, পানকৌড়ি, কায়ন, টিটিভ, সাদা কাক, জংহিল, গয়ার, বাটাস প্রভৃতি পাখির এখানে ভিড়। সজনেখালির আয়তন ৩৬২.৪২ বর্গমাইল। সবচেয়ে ছোট অভয়ারণ্য হলো হ্যালিডে দ্বীপ। ৫.৯৬ বর্গ কিলোমিটার।

বল্লভপুরের মৃগদাব বা ডিয়ারপারক

শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতন যাবার পথে ডানদিকে নেমে যান। খুব কাছেই বল্লভপুরেরর মৃগদাব। আয়তন ৩৫০ একর। ৫০০ একর করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। লাল ল্যাটেরাইট বা কাঁকুরে জমিতে ১৯৫৩-৫৫ সালে নানাজাতের গাছ পুঁতে বন তৈরি করা হয়। মৃগদাবের ভিতরে দুটি পুকুর আছে। সম্বচ্ছর জল থাকে। বৃষ্টির জলে এই কাঁকুরে জমি ক্ষয়ে যেতে থাকে ফি-বছর। জমির ক্ষয়রোধ করার জন্যে শাল আর আকাশনিম লাগানো হয়। কৃষ্ণসার আর চিতল হরিণ ছাড়া হয়। এখন চিতল আছে প্রায় ২৫টি। কৃষ্ণসার ৩৫।

শীতকালে যে কি পরিমাণ পাখি এখানকার জলাশয়ে আসে তা না জানলে বিশ্বাস করা কঠিন। পাখি-প্রেমিকমাত্রে এই বল্লভপুরে অন্তত একবার ঘুরে আসুন। ফুলটুসি টিয়া লম্বপুচ্ছ জলপিপি বেনেবৌ কাজলগৌরী গৈরিকদামা দোয়েল কালিশ্যামা বুলবুল ফটিকজল নানাজাতের খঞ্জনপাখি লালমুনিয়া তিলেমুনিয়া গাংশালিক গোশালিক সাতভাই বা ছাতারে হাঁড়িচাঁচা দুধরাজ ফিঙে হরিয়াল তিলেঘুঘু কণ্ঠীঘুঘু চোখগেলো কোকিল নীলকণ্ঠ বগেরী বাবুনা চশমাপাখি দুর্গাটুনটুনি বসন্তগৌরী আর নানারঙের মাছরাঙা।

শান্তিনিকেতনে ট্যুরিস্ট লজ আছে। বিশ্বভারতীর অতিথিশালা আছে। বল্লভপুরের গায়েই বনবিভাগের চমৎকার একটি বাংলো। মাথায় খড়ের চাল। মাটির মোটা দেয়াল। চারিদিকে ফুল ফুটে 'যেন একটি স্বর্গ রচিত হয়েছে।

পাড়মদন আর বেথুয়াডহরির মৃগদাব

পাড়মদন যেতে প্রথমে ট্রেনে বা বাসে বনগাঁ। বনগাঁ থেকে বাস। এই দুটি মৃগদাবের কাজ শুরু হয়েছিল একসঙ্গে। ১৯৫৮-৫৯ সালে। পাড়মদনের আয়তন প্রায় ১৬০ একর। বেথুয়াডহরির ২২৭ একর। পাড়মদন ইছামতীর তীরে। বেথুয়াডহরি ৩৪নং জাতীয় সড়কের পাশে। দুজায়গাতেই চমৎকার বাংলো। বেথুয়াডহরি দোতলা। পাড়মদনে বাংলো দুটি। একটি ডি এফ ও-র অন্যটি রেনজারের। ডি এফ ও, রানাঘাটকে লিখে পাড়মদনে থাকার অনুমতি সংগ্রহ করতে হবে। বেথুয়াডহরির জন্যে, ডি এফ ও—কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

লালগোলা প্যাসেনজারে চেপে বেথুয়াডহরি ষ্টেশনে নেমে পড়ুন। ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা লাগবে। স্টেশন থেকে রিক্সশায়। একেবারে বাংলোর সামনে। চৌকিদার রেঁধে দেবে। বাংলোর কোনো ভাড়া নেই। শুধু বিজলী আর কাচাকাচির জন্যে যৎসামান্য দু পাঁচ টাকা খরচ। ব্যবস্থা করতে পারলে ইছামতীতে জ্যোৎস্নায় মোটরবোটে ঘুরে বেড়ানো এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা।

পাড়মদনের জন্যে যেখানে বাস থেকে নামতে হবে, সে জায়গাটার নাম নলডুগরি। বনগাঁ দত্তফুলিয়ার বাস যাবে নলডুগরি হয়ে। নলডুগরির ঘাট থেকে নৌকো নিতে পারেন। সময় বেশী লাগবে না। নদীও তেমন চওড়া নয় এখানে। রাস্তা কাঁচা বর্ষাকালে ঐ পথে যাওয়া যাবে না। নদীপথই ভালো। চিতল এখানে প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। জন্তুজানোয়ার কিছু কিছু জাল-ঘেরা ঘরে বন্দী করে রাখা। রামগরু (Mouse deer) বুলবুল, লাফিং থ্রাস ম্যাগপাই ময়ূর প্রভৃতি। জলের কোলে ডাহুক, বাঁশবাগানে দুধরাজ।

বেথুয়াডহরিতে হরিণ প্রথম ছাড়া হয় ১৯৬৯ সালের ৬ই এপ্রিল। একটি পুরুষ একটি স্ত্রী আর এক মৃগশিশু ছেড়ে এই উদ্যানের উদ্বোধন। এখানে চিতল কাঁকর ছাড়াও বেশ কয়েকটি সম্বর আছে। কৃষ্ণসার নেই।

পাড়মদন আর বেথুয়াডহরি মৃগদাব দুজায়গায় বর্ষায় শীতে বহুরকম পাখি আসে, বাসা বাঁধে। শামুকখোল সাপমারা ডাহুক লাল টিট্টিভ বালুবাটাজ-চুপকা বিলাপী পিক্ কুকো ক্ষুদে পেঁচা পাহাড়ি রাতচরা ছোট চিতে মাছরাঙা নীলকণ্ঠ নরুণ পাখি বা বাঁশপাতি সোনালি কাঠঠোকরা পীতশির চিতে আবাবিল অঞ্জন নীল ফিঙে পাওয়াই জংলী কাক কটিকজল সিপাহী বুলবুল লাল বুলবুল এবটের ছাতারে ফিরোজা বা নীলছুটকী পুলকপাখি কালডোরা ছুটকী লাল ফুৎকি বাদামি ফুৎকি গাংরা ডোমরা টুনটুনি চশমা টুনটুনি—এরকম কত না নাম। প্যারাডাইস ফ্লাই ক্যাচর বা দুধরাজের প্রিয় জায়গা হলো বেথুয়াডহরির বনাঞ্চল। আমি অনেক দুধরাজ দেখেছি বেথুয়াডহরি বাংলোর বারান্দায় বসে।

ডায়মণ্ডহারবার

এখানে থাকার জায়গা এই বছর কয়েক আগেও তেমন একটা ছিল না। এখন হয়েছে। সমুদ্রতীরে 'সাগরিকা'। ঘরভাড়া ৪৫ টাকা। খাওয়া আলাদা। একটাকা প্রবেশমূল্য দিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার ব্যবস্থা আছে। হাতমুখ ধোয়া, টয়লেটে যাওয়া এসবের জন্যে রবিবার আর অন্যান্য ছুটির দিন প্রচণ্ড ভিড় হয়। দোতলা ডাকবাংলো একটা আছে। পূর্ত বিভাগের বাংলো। সাগরিকায় রেষ্টুরেণ্ট এবং পানাগার আছে। সুপরিচালিত সাগরিকা ডায়মণ্ডহারবারের অন্যতম আকর্ষণ। কলকাতা থেকেই

সাগরিকায় ছুটি কাটানোর ব্যবস্থা করা যায়। বিবাদীবাগের ট্যুরিষ্ট ব্যুরোর অফিসে।

কাকদ্বীপ

কাকদ্বীপের বাজারের মাঝখানের বাংলোর অবস্থা সঙীন। নদীর ধারের বাংলো অতি চমৎকার। সামনে বাগান। ফুল ফলের গাছ আর দীর্ঘ একটি পুষ্করিণী বাংলোর পিছনে। বারান্দায় বসে সামনের ঝাউ আর ইউক্যালিপটাসের মাঝখান দিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটানো যায়। দুঘরা বাংলো। বিজলী আছে। বিছানামাদুর সব আছে। খানসামা। বসার ঘর। খাবার ঘর আলাদা। দিনে মাথাপিছু ৫.০০। কলকাতার মৌলালীতে সেচবিভাগের অফিস। ওখানে গিয়ে একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার, চব্বিশ পরগণার কাছ থেকে থাকার অনুমতি নিতে হবে। ডায়মণ্ডহারবার থেকে কাকদ্বীপ বাসে মিনিট চল্লিশ লাগবে। কলকাতা-নামখানা সরাসরি বাস হয়েছে। সেই বাসে চেপে কাকদ্বীপে নেমে পড়া যায়। মোট ঘন্টা দুই-আড়াই। ভাড়া দশের মধ্যে।

নামখানা-ফ্রেজারগঞ্জ-বকখালি

নামখানার বাস একটা সকালে, আরেকটা বিকেলে। ভাড়া ১২ টাকা। এসপ্ল্যানেড গুমটি থেকে ছাড়ে নিয়মিত। সেচ বিভাগের বড় বাংলো। ৮টা স্যুইট। এখানে থাকার জন্যে অনুমতিপত্র মৌলালীর সেচ অফিস থেকে পাওয়া যাবে। বাংলোর

চারদিকে মানুষ-সমান উঁচু দেয়াল। সাজানো-গোছানো সুন্দর বাংলো। পাশেই মিঠাপানির পুকুর। ঝাউ আর ইউক্যালিপটাসের মাথায় সমুদ্রবাতাস লেগেই আছে। একটু মাছের গন্ধ সহ্য করতে পারলে এমন সুরক্ষিত একটি বাংলো ছুতিনদিনের জন্যে সহজেই পাওয়া যায়। বাস ঠিক বাংলোর সামনে থাকে। ছাড়েও ওখান থেকে। হাতানিয়া-ছুয়ানিয়া নদী সামনেই। ঐ নদী নৌকায় পার হয়ে, ওপার থেকে বাস ধরে ফ্রেজারগঞ্জ সমুদ্রতীর। ওখানে থাকার জন্যে বনবিভাগের একটি সুন্দর বাংলো আছে। পর্যটকরা এখন আর ফ্রেজারগনজে যান না, বাঁহাতি পথ ধরে চলে যান বকখালি। বকখালিতে পর্যটন বিভাগ বাংলো তৈরি করেছেন। ডরমিটরি আছে। বাস থেকে নেমে বেশ কিছুটা পথ হাঁটতে হবে। বিছানামাহুর বইতে না হলে আর অসুবিধা কী? বিবাদীবাগের ট্যুরিস্ট ব্যুরো অফিসে বুকিং করতে হবে আগেভাগে।

ঝাড়গ্রাম

(১) ঘোড়াধরা ডাকবাংলো—২ ঘর রিজাঃ পূর্তবিঃ মেদিনীপুর
    (পুলিশ থানার পিছনে)

(২) পি ডবলু ডাকবাংলো—২ ঘর " " "
    (স্টেশনের কাছে)

(৩) শান্তিনিকেতন বোরডিং
    (বাজার অঞ্চলে)

(৪) বনফুল হোটেল

বেলপাহাড়ি

(১) বনবিভাগের ডাকবাংলো ৪ স্যুইট, রিজারভেশন :
কিংবা
ডি এফ ও,
মেদিনীপুর
কনজারভেটর অব ফরেসট্‌স
সেনট্রাল সারকেল, আলিপুর।

এছাড়া, কোনো হোটেল বা থাকার জায়গা নেই। এখান থেকে জিপ পেলে কাঁকড়াঝোড় অরণ্যে যাওয়া যেতে পারে। গভীর এই জঙ্গলের পুরো পথটাই পাহাড়িপথ। বর্ষায় দুর্গম। পাহাড়ের মাথায় একটি ডাকবাংলো আর জন্তুজানোয়ার দেখার জন্যে ওয়াচটাওয়ার আছে। প্রচুর হাতি। ছোট বাঘ, ভালুক, হরিণ আর পাহাড়ি বিষধর সাপ। বাংলোটি বনবিভাগের। আলিপুর অফিস থেকে অনুমতি নেওয়া যাবে। কিংবা ডি এফ ও, ঝাড়গ্রাম।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বনবিভাগের বাংলো আছে মোট একানব্বইটি।

হাজারিবাগ ন্যাশনাল পারক

(১) ট্যুরিষ্ট লজ, ন্যাশনাল পারক : দিনে মাথা পিছু ৫ টাকা

(২) ট্যুরিষ্ট কটেজ ,, : দিনে ২-শয্যা ১২ থেকে ১৫ টাকা
চার শয্যাবিশিষ্ট ঘর ১৪ টাকা

(৩) ক্যানারি বনবাংলো, ন্যাশনাল পারক : দিনে ২-শয্যাবিশিষ্ট ঘর ১৭ টাকা

এখানের কোথাও বিজলী নেই। লজ আর কটেজে ক্যানটিন আছে। বনবাংলোয় রাঁধুনি বা চৌকিদার। রিজারভেশনের জন্যে—ডি এফ ও পশ্চিম বিভাগ, হাজারিবাগকে লিখতে হবে।

(৪) ট্যুরিষ্ট লজ, হাজারিবাগ : শয্যাপ্রতি দিনে ৩'৫০ পয়সা
: ২-শয্যা " ৫ টাকা
: জনপ্রতি " ডরমিটরি ২ টাকা

রিজারভেশনের জন্যে : এ্যাসিসট্যাণ্ট ট্যুরিষ্ট ইনফরমেশন অফিসার, ট্যুরিষ্ট ইনফরমেশন সেণ্টার, হাজারিবাগ ফোন ২২৬

(৫) সারকিট হাউস : শয্যাপ্রতি দিনে ৯'৫০ পয়সা
রিজারভেশন : ডেপুটি কালেক্টার

(৬) রেষ্ট হাউস, জেলা পরিষদ : শয্যাপ্রতি দিনে ২'৫০
(হাজারিবাগ) : একজিকিউটিভ ইনজিনিয়র, জেলা পরিষদ, হাজারিবাগ

(৭) ডি ভি সি সারকিট হাউস : শয্যাপিছু দিনে ১০ টাকা,
(হাজারিবাগ) এয়ারকনডিশন ২৫-৩৫ দিনে

(৮) ডি ভি সি ইনসপেকশন বাংলো : শয্যাপিছু ৮ টাকা,
(হাজারিবাগ) এয়ারকনডিশন ২০-২৫ টাকা দিনে।

(৯) ডি ভি সি ডরমিটরি : মাথাপিছু দিনে ৪ টাকা
(হাজারিবাগ)
রিজারভেশন : ডিরেক্টার, রিহ্যাবিলিটেশন, ডি ভি সি হাজারিবাগ অথবা চীফ ইনফর্মেশন অফিসার, ডি ভি সি, ভবানী-ভবন, আলিপুর, কলিকাতা-২১ (ফোন-৪৫১১১৯)। এই সমস্ত বাংলোয় বিজলী আছে। চৌকিদার আছে।

নালন্দা

---

(১) ইনস্‌পেকশন বাংলো : রিজারভেশন, সুপারিনটেনডেন্ট, আরকিওলজিক্যাল সারভে অফ ইনডিয়া, ইসটারন সারকেল, পাটনা (রাঁধুনি আছে)।

(২) নালন্দা রেষ্ট হাউস : ৪ ডবল রুম। ঘরপিছু ৫ টাকা রাঁধুনি বহাল। রিজারভেশন, ডিভিশনাল অফিসার, পি ডবলু ডি, বিহারশরীফ।

(৩) পালি ইনসটিট্যুট (হস্টেল) : ৬-ঘরা, ভাড়া নেই। ডিরেক্টরের কাছে চিঠি লিখে থাকার অনুমতি নিতে হবে।

(৪) রাসবিহারী বিদ্যালয় : ভাড়া নেই। রিজারভেশন,
(ছাত্রাবাস) হেডমাষ্টার

(৫) ইউথ হস্টেল : হলঘর, ৫০ পয়সা মাথাপিছু।
রিজার্ভেশন, বি ডি ও, রাজগীর

(৬) জৈন ধর্মশালা (জৈনদের জন্যে)
সনাতনী ধর্মশালা
তিব্বতী ধর্মশালা

রাজগীর বা রাজগৃহ

(১) ট্যুরিষ্ট বাংলো, বিহার সরকার : ১২টি দুই শয্যা-বিশিষ্ট ১০ টাকা দৈনিক। রিজার্ভেশন, ম্যানেজার
১-৮ শয্যাবিশিষ্ট মাথা পিছু ৫ টাকা।
ফোন : ৩৯
২-১০ " " ৩ টাকা
বিছানামাদুর কিছু নিতে হবে না। খাবারদাবার স্বতন্ত্র। বিহার গ্রামোদ্যোগের নানা জিনিস কিনতে পাওয়া যায়। বসার জন্যে বিরাট হলঘর। আমিষ, নিরামিষ। দাম মাঝারি।

(২) ডি বি ইনসপেকশন বাংলো : ১০টি ডবল-বেডেড ঘর।
(নতুন) আলাদা বিছানা নিলে আরো ৫ টাকা। খানসামা অছে। বিছানাপত্র। রিজার্ভেশন : ডিসট্রিকট ইনজিনিয়ার, ডিসট্রিকট বোরড, পাটনা।

(৩) ডি বি ইনসপেকশন বাংলো : ৪টি ডবলবেডেড ঘর।
(পুরনো) ৫ টাকা ঘরপিছু। খানসামা নেই। বিছানা নেই। জেলা বোরডের প্রধানকে লিখতে হবে।

(৪) ডি বি রেস্ট হাউস : ৪ ঘর। ৩—৩·৫০ দিনে মাথাপিছু। তিনটি ফ্ল্যাট আছে। ফ্ল্যাটপিছু ৭।৮ টাকা। রান্নার ব্যবস্থা নেই। বিছানা আনতে হবে।

(৫) বনবিভাগের রেস্ট হাউস : ৩-শয্যা। মাথাপিছু দিনে ৩ টাকা। সাজানো ঘর। খানসামা নেই। রিজারভেশন, ডি এফ ও, গয়া। ফোন : ৭

(৬) মন্ত্রী-বিশ্রামালয় : ১৬ ফ্ল্যাট। ৫ টাকা ফ্ল্যাটপিছু দিনে। ফ্ল্যাটে দু ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম, উঠোন, খানসামা। রিজারভেশন : এস ডি ও (পি ডবলু ডি) রাজগীর। টেলিফোন : ৩১

(৭) পি ডবলু সারকিট হাউস : ৮টি ডবলবেড। ১০ টাকা
ফোন : ২৭ ঘরপিছু দিনে। ডানলোপিলোর বিছানা। অনুমতি এস ডি ও।

(৮) পি ডবলু ডরমিটরি : ৪৮ শয্যা। ১—১·৫০ মাথাপিছু দিনে। খানসামা আছে। এস ডি ওকে লিখতে হবে। ফোন : ২৬।

(৯) রেল রিটায়ারিং রুম : ১টা দু শয্যার ঘর। শয্যাপিছু ৩ টাকা। দুজনের ৫ টাকা। রিজারভেশন, স্টেশন মাস্টার। রাজগীর।

(১০) ইউথ হসটেল : ২টো হলঘর। সভ্য আর ছাত্রদের জন্যে নির্দিষ্ট। মাথাপিছু দিনে ৫০ পয়সা। রিজারভেশন : বি ডি ও, রাজগীর।

(১১) ধর্মশালা। শ্বেতাম্বর জৈন ধর্মশালা, ফোন ২০। দিগম্বর জৈন ধর্মশালা, ফোন ৩৫। সনাতন ধর্মশালা, রামেশ্বরী মহাবীর ধর্মশালা, সুন্দরসাহু ধর্মশালা, থাথেরা, বড়ী সঙ্গত, নির্মল সঙ্গত, রামকৃষ্ণ মঠ (বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (রাজগীর বাজারের কাছে), জাপানী মন্দির, বার্মিজ মন্দির, গোরক্ষণী।

বোধগয়া

(১) ট্রাভেলারস লজ, ফোন ২৫। সিঙ্গল রুম ৮। ডবল ৪। খাওয়া-থাকা নিয়ে মাথা পিছু দিনে ২৫-৩৫ টাকা। এতে শুধু সকালের জলখাবার আর থাকা বাবদ খরচ ধরা হয়। দুপুর রাতের খাওয়া আলাদা। পৃথক দিতে হবে। রিজারভেশন, ম্যানেজার টি-লজ, বোধগয়া।

(২) মহাবোধি রেস্ট হাউস: সিঙ্গল ২। ডবল ৫। থাকার খরচ নেই। খাওয়া অন্যত্র। রিজারভেশন: প্রধান ভিক্ষু, মহাবোধি সোসাইটি, বোধগয়া।

(৩) পি ডবলু ইনসপেকশন বাংলো: ডবল দুই। চার্জ ঘরপিছু ৮—১২ টাকা। খানসামা আছে। রিজারভেশন, একজি-কিউটিভ ইনজিনিয়ার, ওয়েস্টার্ন, ডিভিশন, গয়া

(৪) স্টেট গেসট হাউস: (পি ডবলু ডরমিটরি) ৪৮ শয্যা। মাথাপিছু দিনে দুটাকা।
রিজারভেশন, একজি: ইনজিনিয়র গয়া। ফোন ২২

(৫) ধর্মশালা: বিড়লা ধর্মশালা, রিজার্ভ: কেয়ারটেকার
চীনা মোনাস্টেরি, প্রধান ভিক্ষু
তিব্বতী " , "
বর্মী " , "
থাই " , "
জাপানী " , "

দীঘা

সড়কপথে কলকাতা থেকে ২৪৩ কিলোমিটার। ৫।৬ ঘণ্টার পথ। কলকাতা ছাড়াও বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, সিউড়ি, আর ঝাড়গ্রাম থেকে নিয়মিত বাস। ট্যুরিস্ট লজ দীঘার সবচেয়ে দামি হোটেল। ছিমছাম সাজানো-গোছানো দু-শয্যার ঘর। একতলায় রেস্টুরেন্ট এবং বার। সৈকতাবাসে ৪-শয্যার স্যুইট, রান্নাঘর। দু-শয্যার ঘরও প্রচুর। একতাল্লা থেকে দোতলায় ১ টাকা বেশি। ১৬ আর ১৮ দিনে। চীপ ক্যানটিন ডরমিটরির মত্ন। এছাড়া আছে একতলা কটেজ। রান্নাঘর, রান্নার বাসনকোসন সমস্ত মজুত। ইচ্ছেমত খাবার নিজেরা তৈরি করে নেওয়া যায়। ভাড়ায় স্টোভ মেলে। বাটনা করা, ঝাঁটপাট দেবার জন্যেও কাজের লোক পাওয়া যায়। একঘরা, দু-ঘরা, দু-ধরনের কটেজ আছে।

ট্যরিস্ট লজের রিজারভেশনের জন্যে : ট্যুরিস্ট ব্যুরো,
৩/২ বিবাদীবাগ, পূর্ব, কলকাতা
ফোন ২৩৪৮৭১
কিংবা, ম্যানেজার, ট্যুরিস্টলজ, দীঘা,
মেদিনীপুর। ফোন: ২০

অন্যান্যের জন্যে অ্যাডমিনিসট্রেটর, দীঘা ডেভেলপমেনট স্কীম।

সৈকতাবাস এবং ট্যুরিস্ট কটেজের জন্যে কলকাতা অফিসে যোগাযোগ করতে হবে। না হলে অ্যাডমিনিসট্রেটর।

অন্যান্য হোটেল : কাফেটেরিয়া (দীঘা ৪৪),
বোস লজ, নীলাচল (দীঘা ৫৩), সী ভিউ লজ,
সারদা বোর্ডিং হাউস (দীঘা ৪৮), চম্পা সৌধ, বেলা নিবাস,
বিজলী নিবাস (দীঘা ৩৮), সাগরিকা প্রভৃতি

চিলকা

চিলকা হ্রদে বালুগাঁও, চিলকা, খালিকোট আর রম্ভা রেলস্টেশনের যে কোন একটিতে নেমে যাওয়া সম্ভব। তবে সব চেয়ে সুবিধে বালুগাঁও। ওখানে সাইকেল রিকশা আছে।

বালুগাঁও	বেরহামপুর	থেকে	৮৩	কিলোমিটার	(৫২ মাইল)
"	ভুবনেশ্বর	"	৮৬	"	(৬০ ")
"	কলকাতা	"	৫৬৫	"	(৩৫৩ ")
"	গোপালপুর	"	৯৯	"	(৬২ ")

" ভায়া ভুবনেশ্বর পিপলি পুরী থেকে ১৫৮ কিমি (৯৯ মাইল)

হ্রদে মোটরবোটে বেড়ানো যেতে পারে। এ্যাসিসট্যাণ্ট ডিরেকটর, ফিশারিজ, বালুগাঁও, ওড়িশা এর কাছে লিখে ব্যবস্থা করতে হবে। যতদূর মনে পড়ছে ঘণ্টায় ১৫ থেকে ২০ টাকা।

থাকবার জায়গা :

(১) ডাকবাংলো, বালুগাঁও। মাথাপিছু ৪ টাকা।
রিজারভেশন : তহশিলদার,
বানপুর অথবা এসডিও খুরদা রোড।
বিছানা নেই, রান্নার ব্যবস্থা নেই।

(২) পি ডবলু ইনশপেকন বাংলো, " ৫ টাকা একজি : ইনজিনিয়ার
(বরকুল) ভুবনেশ্বর ডিভিশন
বিছানামাদুর আছে
চৌকিদার আছে।

(৩) পি ডবলু ইনসপেকশন " ৬ " একজি : ইনজিনিয়ার
(খালিকোট) গনজাম
রান্নার ব্যবস্থা নেই।

(৪) চিলকারাণী হাউসবোট, ছ ক্যাবিনের জন্যে ৪০ টাকা, মাথাপিছু
(বালুগাঁও) ১০ টাকা দিনে। রিজাঃ কালেকটর পুরী অথবা একসাইজ সুপারিন-টেনডেন্ট, পুরী। রাঁধুনি আছে।

(৫) খাসমহল ইনসপেকশন মাথাপিছু ৪ টাকা এসডিও, খুরদা রোড, বাংলো, (বানপুর) বা তহশিলদার, বানপুর।
ট্যুরিস্ট বাংলো, রম্ভা সিঙ্গল ১০ টাকা, ডবল ১৮ টাকা।
(দ্বিতীয় শ্রেণী) রিজারভেশন: এ্যাসিঃ ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন অফিসার, রম্ভা বা এ্যাসি: ডিরেকটর [টি] ভুবনেশ্বর

(৬) রেলের রিটায়ারিং রুম, ৬ টাকা, রিজারভেশন:
(বালুগাঁও) স্টেশন মাষ্টার, বালুগাঁও

গোপালপুর অন-সী:

বেরহামপুর গঞ্জাম থেকে ১৬ কিলোমিটার। বাস আছে।
অটো রিকশা আছে।
ট্যাক্সিতে ২৫ টাকা বড়ো জোর।

থাকার জায়গা:

(১) পামবীচ হোটেল [ওয়েষ্টার্ন ষ্টাইল] খাওয়া-থাকা ১০০-১৫০ টাকা দৈনিক।

(২) সারকিট হাউস—রিজারভেশন: সাব কালেকটর, বেরহামপুর, গনজাম

(৩) ইনসপেকশন বাংলো: „ সুপারিনটেনডিং ইনজিনিয়ার, সাদার্ন সার্কেল বেরাহামপুর

(৪) ইউথ হসটেলঃ রিজাঃ সার্কেল পোস্ট মাসটার, গোপালপুর।
১৬টা বেড প্রতি ঘরে।
সমুদ্রতীর থেকে একটু দূরে।
সভ্য হলেই থাকা যাবে।
মাথা পিছু ২ টাকা।

হোটেল বলতে সী-ভিউ, কলবেন হাউস, হলিডে ইন, ওসান হাউস, লোবোসলজ, রহমানিয়ামনজিল, হোটেল ডয়ভায়লি প্রভৃতি। ভাড়া হিসেবেও বাড়ি পাওয়া যায়।

উত্তরবঙ্গের বিশ্রামাগার, ডাকবাংলো

দার্জিলিং জেলা ॥

দারজিলিং
শিলিগুড়ি — পূর্ত বিভাগের বাংলো
কালীঝোরা — রিজারভেশন ঃ একজিকিউটিভ
কার্শিয়াং — ইনজিনিয়ার, পি ডবলু ডি
কালিম্‌পঙ্‌
তিনধারিয়া
তাকদা
রিমবিক
লাভাপাহাড়

ডাওহিল
চুনাভাটি
সুখনা
ব্যাঙডুবি
রাংলং
রাঙ্গী
মানা
বাগোরা
পাশিতিং
সেভোক
কালীঝোরা
রেয়ং
সামসিং
লাভা
রংপো
গরুবাথান
থুম্‌য়ানী
খড়িবাড়ি
নকশালবাড়ি
বাতাসী
সিংলা

বনবিভাগের বিশ্রামভবন
রিজারভেশন : ডি এফ ও
অথবা
এ্যাসিসট্যানট কনজারভেটর
অফ ফরেসটস,
নর্দারন ডিভিশন

জলপাইগুড়ি জেলা ॥

জলপাইগুড়ি	
আলিপুরদুয়ার (সারকিট হাউস)	
বীরপাড়া	
ময়নাগুড়ি	
ধূপগুড়ি	
শিলবাড়ি	
কামাখ্যাগুড়ি	
কুমারগ্রাম	পূর্তবিভাগের পরিদর্শন বাংলো
কালচিনি	রিজারভেশন : একজিকিউটিভ
মাদারিহাট	ইনজিনিয়ার, পি ডবলু ডি
বেতিয়াসোল	
লাটাগুড়ি	
জয়ন্তী	
বক্সাদুয়ার	
হাতিপোতা	
চাল্সা	
গয়েরকাটা	
লঙ্কাপাড়া	

গরুমারা	রায়ডাক	বনবিভাগের বিশ্রামভবন
চাপড়ামারি	ভুটানঘাট	রিজারভেশন : ডি এফ ও
রাজাভাতখাওয়া	খুঁটিমারি	অথবা
জয়ন্তী	পাকবাড়ি	এ্যাসিসট্যানট কনজারভেটর
বক্সাদুয়ার	সুলকোপাড়া	অব ফরেসটস,
কুমারগ্রাম	সামসিং	নরদারন ডিভিশন

কোচবিহার জেলা ॥

তুফানগঞ্জ	
দিনহাটা	
মাথাভাঙা	
মেখলিগঞ্জ	
শীতলকুচি	পূর্ত বিভাগের ডাকবাংলো
শীতলদহ	রিজারভেশন ঃ একজিকিউটিভ
গোঁসানিমারি	ইনজিনিয়ার, পি ডবলু ডি
কুচবিহার (সারকিট হাউ	
কুচবিহার (ডাকবাংলো	

ওদলাবাড়ি	বনবিভাগের বিশ্রাম ভবন
আমবাড়ি	রিজারভেশন ঃ ডি এফ ও
জলদাপাড়া (বড়দাবড়ি)	অথবা
জালাবাড়ি	এ্যাসিসট্যানট কনজারভেটর
নীলপাড়া	অব ফরেসটস
ভুটারি	নরদারন ডিভিশন
হন্সং ডাকবাংলো	

রাঁচী

কলকাতা থেকে বর্ধমান আসানসোল হয়ে ৪৫৬ কিমি (২৮৫ মাইল)
" " কোলাঘাট বহরাগোড়া " ৩৯২ " (২৪৫ ")
পাটনা " বখতিয়ারপুর নওয়াদা কোডারমা
হাজারিবাগ রামগড় হয়ে ৩৩৬ " (২১০ মাইল)

নিয়মিত সরকারি পরিবহন সংস্থার বাস আছে যে সব জায়গা থেকে, তা হলো : পুরুলিয়া, চাইবাসা, জামশেদপুর, ডালটনগনজ, পাটনা, গয়া, বাঁকুড়া, বারাউনি, ভাগলপুর, দেওঘর, গিরিডি, রাউরকেলা, মজঃফরপুর, নেতারহাট, দ্বারভাঙ্গা, আওরঙ্গবাদ, ধানবাদ, জাজপুর রোড।

পশ্চিমা কেতার হোটেল।	ঘরের সংখ্যা	বাথ	শয্যা	খাবারসমেত ঘরভাড়া		শুধু ঘরভাড়া	
				এসি	এসি নয়	এসি	এসি নয়
				সিঙ্গল / ডবল	সিঙ্গল / ডবল	সিঙ্গল / ডবল	সিঙ্গল / ডবল
দক্ষিণ পূর্ব রেলের হোটেল স্টেশন রোড রাঁচী ফোন ১১৯৬	২২	৪৪	৪৪	৭০ টাকা / ৯০ টাকা	৪০ টাকা / ৭০ টাকা	৫০ টাকা / ৬৫ টাকা	২৮ টাকা / ৫০ টাকা
হোটেল যুবরাজ ডোরানডা বাররণ রোড রাঁচী—২ ফোন ২৪০০	১৯	১৯	৩৬	—	—	৩৭·০০ / ৫৩·০০	২৪·০০ / ৪১·০০
মাউনট হোটেল ওলড হাজারিবাগ রোড রাঁচী	১৪	১৪	২০	৩০·০০ / ৫৫·০০			

ভারতীয় কায়দার হোটেল।	ঘরের সংখ্যা	বাথ	শয্যা	খাবারসমেত ঘর ভাড়া	শুধু ঘরভাড়া
আনন্দ হোটেল লাইন ট্যাংক রোড রাঁচী ফোন ৭৬৭	২২	—	৩৪		২০·০০ / ৪০·০০
আর্য হোটেল লালপুর চক, রাঁচী, ফোন ৩৫৫	২৩	—	৩৯		১৫·০০ / ৩৫·০০
বিনোদ আশ্রম মেন রোড, রাঁচী, ফোন ১৭৯					১০—১৫·০০ / ২০—৩৫·০০
গুজরাট হোটেল মেন রোড, ফোন ১১৩৪					১০—১৫·০০ / ২০—৩০·০০
হোটেল দ্য রীট্রিট সারকুলার রোড, লালপুর। ফোন ৩৫৩					১৫—২৫·০০ / ২০—২৫·০০

এরকম একডজনেরও বেশি হোটেল : মিডল্যানড, রাজ. রাঁচী রেস্ট হাউস, সঙ্গম হোটেল, আর্যনিবাস প্রভৃতি।

অন্যান্য থাকবার জায়গা	ঘর	দর	রিজার্ভেশন
এ. এ. ই. আই অতিথিশালা	২		সেক্রেটারি, এ এ ই আই
(সভ্যদের জন্যে)	[১ সিঙ্গল, ১ ডবল]	৭-৫০ দিনে	অবধায়ক কে এন রয় সনস
১৫ জেল রোড (ইস্ট)			মেন রোড। ফোন ৮৪
ফরেসট রেসট হাউস	৪	১'০০ দিনে	ডি এফ ও, রাঁচী
পরিদর্শন বাংলো	৪	৭'৫০	একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার
সারকুলার রোড			পি ডব্লু ডি, রাঁচী
পরিদর্শন বাংলো	৬	৭'৫০	"
ডোরানডা			
মাড়োয়ারি আরোগ্যভবন	ঘর এবং ছোট বাড়ি ভাড়াতে		সেক্রেটারি, মাড়োয়ারি আরোগ্যভবন
বুটি রোড। ফোন ৩৩০	পাওয়া যায়।		
নিউ সারকিট হাউস			
সারকুলার রোড। ফোন ৫০১	১০	৫'০০ দৈনিক	ডেপুটি কমিশনার, রাঁচী। ফোন ৬৭
ওলড সারকিট হাউস			
সারকিট রোড। ফোন ১১৪	৮	৫'০০ "	"

	ঘর	দর	রিজার্ভেশন
এন সি ডি সি রেসট হাউস ফোন ৫৬৯	৮	১২˙০০ সিঙ্গল / ১৫˙০০ ডবল	পি আর ও, এন সি ডি সি, দ্বারভাঙা হাউস, রাঁচী
রেলের রিটায়ারিং রুম	৪	(ডবল) ৫˙০০ মাথাপিছু	স্টেশন মাস্টার, রাঁচী (প্যাসেনজারদের জন্যে)

বংশীধর ধর্মশালা
ভূমল „
ব্রাহ্মণ „
জৈন „
মোদি „

— সবগুলিই আপার বাজার অঞ্চলে

ভুবনেশ্বর

কলকাতা থেকে ৪৩৭ কিমি (২৭৩ মাইল)

পুরী ,, ৬ ,, (৩৯ মাইল)

বেরহামপুর, চিলকা, কটক, কোনারক, পারাদীপ, পুরী, সম্বলপুর প্রভৃতির সঙ্গে ভুবনেশ্বরের নিয়মিত বাস যোগাযোগ রয়েছে।

ভারতীয় খাবারের হোটেল	শুধু ঘর
বানারসওয়ালা হোটেল ভুবনেশ্বর—১। ফোন ২৭	৭'৫০ সিঙ্গল ১০'০০ ডবল
হোটেল পুষ্পক ভুবনেশ্বর—৬। ফোন ১৫২৫	১০'০০ ১৫'০০
নিউ সেনট্রাল হোটেল ভুবনেশ্বর—১	৬'০০ ১০'০০
রাজমহল হোটেল বাপুজী নগর, ভুবনেশ্বর ১ ফোন ৮২	১০'০০ সিঙ্গল ১৫'০০ ডবল

ট্রাভেলার্স'লজ গৌতম নগর, ভুবনেশ্বর—৬ ফোন : ৭৫৫	সিঙ্গল ডবল ৪০·০০ ৭০·০০ ১২ বছরের কম ছেলেমেয়ের জন্যে শতকরা ৫০% বাদ। খাবার আলাদা।	অতিরিক্ত শয্যা প্রতি ৩০·০০	রিজার্ভেশন : ম্যানেজার, ট্রাভেলার্স লজ
ট্যুরিস্ট বাংলো (২য় শ্রেণী) পুরী রোড, ভুবনেশ্বর—৬ ফোন : ৬৮৯	৪·২৫ (ডরমিটরি)	৯·৫০ ডবল	রিজার্ভেশন : ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন অফিসার; ভুবনেশ্বর
স্টেট গেসট হাউস ফোন : ৪৫৩	খাওয়া + থাকা একজনের জন্যে ৪৫·০০ + ৫৫·০০	খাওয়া + থাকা দুজনের জন্য ৬০—৭৫·০০	রিজার্ভেশন : ম্যানেজার, স্টেট গেসট হাউস ভুবনেশ্বর
সারকিট হাউস	৩·৭৫ (একক) শুধু ঘর ভাড়া		রিজার্ভেশন : এস ডি ও. ভুবনেশ্বর। ফোন : ৯২
ইনসপেকসন বাংলো পি ডবলু ডি	৩·৭৫ (একক) ,,	,,	,, : সুপারিনটেনডিং ইনজিনিয়ার (সেনট্রাল সার্কেল) ভুবনেশ্বর। ফোন : ২১
খণ্ডগিরি ইউথ হসটেল খণ্ডগিরি, ভুবনেশ্বর	০·৫০ (একক) ডরমিটরি সভ্যদের জন্যে		,, : ট্যুরিস্ট অফিস বা ডাঃ বি মিশ্র। অবধায়ক : এগরিকালচারাল কলেজ, ভুবনেশ্বর

ধর্মশালা—দুধওয়ালা, ডালমিয়া, জৈন ধর্মশালা (খণ্ডগিরি গুহার কাছে); পতঞ্জিয়া ধর্মশালা (স্টেশনের কাছে)

হীরাকুঁদ

হীরাকুঁদের নিকটবর্তী রেলস্টেশন সম্বলপুর রোড। বাঁধ থেকে ১০ মাইল।

বেরহামপুর থেকে হীরাকুঁদ		৪৯৪ কিমি	(৩০৮ মা)
ভুবনেশ্বর	,, ,,	৩২৮ ,,	(২০৫ মা)
কলকাতা	,, ,,	৬২১ ,,	(৩৮৮ মা)
ঝাড়সুগুদা	,, ,,	৭২ ,,	(৪৫ মা)
সম্বলপুর	,, ,,	১৬ ,,	(১০ মা)

থাকার জায়গা

	শুধু ঘর	খাবার খরচ
অশোক নিবাস ফোন : ৬২ বারলা	২০·০০ সিঙ্গল ২৫·০০ ডবল	২০·০০ একজনের
রেসটহাউস (১ম শ্রেণী) ফোন : ৫৫। বারলা	৬·৫০ জনপ্রতি	খানসামা আছে।
স্টেনোরুম (রেসট হাউসের সঙ্গে)	২·৭৫ ,,	রান্নার জিনিষপত্র আছে
হীরাকুঁদ মুসাফির খানা (বাজার অঞ্চল, হীরাকুঁদ)	০·৫০ ,,	বিছানামাদুর নেই

রিজার্ভেশন : সবগুলির জন্য সুপারিনটেনডিং ইনজিনিয়ার হীরাকুঁদ ড্যাম প্রজেকট, বারলা। ফোন : বারলা—১

পি ডবলু পরিদর্শন বাংলো ৩'০০ জনপ্রতি ৫'০০ দুজনের জন্যে

বারলা

স্টেজিং ডাকবাংলো ৩'০০ জনপ্রতি রিজার্ভেশন : একজি : ইনজিনিয়ার, রোডস এ্যাণ্ড বিলডিংস, পি ডবলু ডি, সম্বলপুর।

পি ডবলু, সম্বলপুর ৫'০০ দুজন

সারকিট হাউস ৩'০০ জনপ্রতি ,, : ডি সি—সম্বলপুর

সম্বলপুর

ধর্মশালা— মাড়োয়ারি ছোলট্রি, সম্বলপুর

রেস্তোরাঁ— কেরালা হোটেল, জনতা হোটেল, পানজাবি হিন্দু হোটেল

হাজারিবাগ

স্থান	ভাড়া		যোগাযোগ
সারকিট হাউস	৯.৫০	মাথাপিছু	ডি সি, হাজারিবাগ
রেসট হাউস, জেলাপরিষদ	৩.৫০	”	একজি : ইনজিনিয়ার, জেলা পরিষদ
ডি ভি সি সারকিট হাউস	৫.০০	”	ডিরেকটর, রিহ্যাবিলিটেশন, ডি ভি সি, হাজারিবাগ। অথবা চীফ ইনফরমেশন অফিসার, ডিভিসি, ভবানীভবন আলিপুর, কলকাতা-২১। ফোন ৪৫১১১৯
” ইনসপেকশন বাংলো	৫.০০	”	(ঐ)
” ডরমিটরি	২.০০	”	(ঐ)

গয়া

অবন্তিকা হোটেল স্টেশন রোড। ফোন ২৮৮	৮ ঘর	১১ শয্যা	১০·০০ / ১৫·০০
কল্পনা রেসট হাউস কাছারি রোড। ফোন ৪৫১	৭ "	১১ "	৮·০০ / ১০·০০
কৃপাল লজ চক, গয়া	১২	১৬	৫·০০ / ১০·০০
রাজপাল হোটেল স্টেশনরোড	৪	৭	৪·০০ / ৮·০০
পানজাব হোটেল শহীদ রোড, চৌক ফোন ১৯১	১৩	১৫	৫·০০ / ১০·০০

স্টেশন ভিউ হোটেল, ভুজ হোটেল প্রভৃতি হোটেল মধ্যবিত্ত মাপের।

অন্যান্য থাকার জায়গার মধ্যে—

(১) সারকিট হাউস — ৬ ডবল ঘর মাথাপিছু দিনে ৩·৫০ রিজার্ভেশন : জেলা ম্যাজিসট্রেট, গয়া। ফোন ৮৩। খানসামা আছে।

(২) জেলা বোরড ডাকবাংলো — ৪ সিঙ্গল ঘর মাথাপিছু দিনে ৩·৫০ রিজার্ভেশন : যাবার দশ দিন আগে ১ টাকা জমা দিয়ে অনুমতি সংগ্রহ করতে হবে।

(৩) রেলওয়ে রিটায়ারিং রুম — ৪ সিঙ্গল ঘর মাথাপিছু দিনে ৬·০০ রিজার্ভেশন : স্টেশন মাসটার গয়া (প্যাসেনজারদের জন্যে)

ধর্মশালা :—

মাড়োয়ারি ধর্মশালা ওলড গোডাউন	২৬ ঘর	গয়া স্টেশন থেকে মাইল খানেক দূর
পঞ্চায়েতী ধর্মশালা গোডাউন, গয়া	২০ „	„ „ ১½ মাইল
টিলহা ধর্মশালা টিলহা, গয়া	৭৫ „	„ „ ১½ „
স্টেশন ধর্মশালা স্টেশন রোড, গয়া	১০ „	„ „ ১ মাইলের কম